ব্রহ্মদৈত্যের

একাদশ কাহিনি

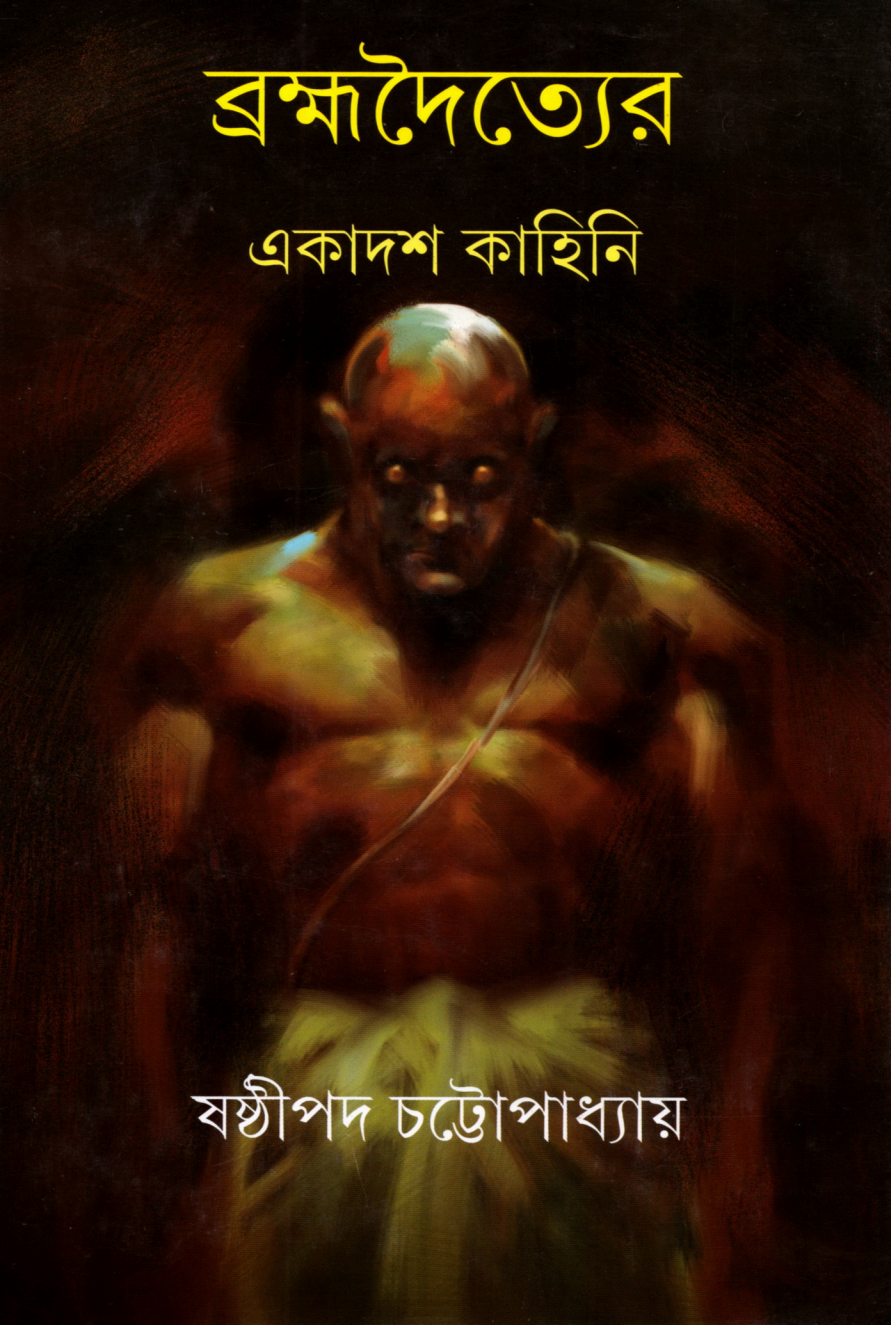

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

বাংলা পিডিএফ এর জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

boidownload24.blogspot.com

Facebook.com/bnebookspdf

facebook.com/groups/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি বা সংরক্ষণ করি না, শুধু ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা পিডিএফ শেয়ার করি।

Email: jirograbity@gmail.com

ব্রহ্মদৈত্যের একাদশ কাহিনি • ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

রোমাঞ্চকর কাহিনি রচনায় ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের জুড়ি নেই। ঝরঝরে ভাষা ও গল্পের রহস্যময়তায় পাঠককে মুগ্ধ করার ভাষা তাঁর জানা। 'ব্রহ্মদৈত্যের একাদশ কাহিনি' সংকলনে এগারোটি দুর্দান্ত গল্প— রোহিণীর রাত, মায়ামাধুরী, নৌরঙ্গীর মোহিনী, চন্দ্রনাথ ও দিব্যপুরুষ, বিশ্বরূপের অলৌকিক দর্শন, উচিতপুরের যাত্রী, বিদ্যাবতীপুরের কাজললতা, আহিরণ রজনীতে, যুবচন্দ্রিমাতে, গিরিডিহির পোড়ো বাড়িটা, মনিহারি ঘাটের কাহিনি। চমকপ্রদ পরিবেশনায় মিশে আছে গা-ছমছমে আবহ। বইয়ের পাতা থেকে পাঠক চোখ তুলতেই পারবেন না।

২০০.০০

ISBN 978-93-88870-93-1

ব্রহ্মদৈত্যের একাদশ কাহিনি

ব্রহ্মদৈত্যের একাদশ কাহিনি

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০২০

© ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-88870-93-1

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪
থেকে মুদ্রিত।

BRAHMHADAITYER EKADASH KAHINI

[Stories]

by

Sashtipada Chattopadhyay

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta 700009

আদরের নাতি
বিভান হাজরা
দীর্ঘজীবেষু।

আমাদের প্রকাশিত
এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

আরও পঞ্চাশটি ভূতের গল্প
গোয়েন্দা কাহিনি দশ
গোয়েন্দা রহস্য সাত
চতুর গোয়েন্দা চতুরভিযান
দশটি কিশোর উপন্যাস
পঞ্চাশটি ভূতের গল্প
পাঁচটি রহস্য গোয়েন্দা
পাণ্ডব গোয়েন্দা সমগ্র (১-২)
পাণ্ডব গোয়েন্দা (৭-৩০)
ব্রহ্মদৈত্যের অলৌকিক কাহিনি
রহস্য কাহিনি ছয়
রহস্য কাহিনি দশ
রহস্য গোয়েন্দা আট
সোনার গণপতি হিরের চোখ
সেরা গোয়েন্দা পঁচিশ
সেরা রহস্য পঁচিশ

সূচি

রোহিণীর রাত ৯
মায়ামাধুরী ১৮
নৌরঙ্গীর মোহিনী ৩৬
চন্দ্রনাথ ও দিব্যপুরুষ ৪৫
বিশ্বরূপের অলৌকিক দর্শন ৫২
উচিতপুরের যাত্রী ৬৮
বিদ্যাবতীপুরের কাজললতা ৭৫
আহিরণ রজনীতে ৮৪
যুবচন্দ্রিমাতে ১০২
গিরিডিহির পোড়ো বাড়িটা ১১১
মনিহারি ঘাটের কাহিনি ১৩৩

রোহিণীর রাত

মধুবন থেকে গুলমা টি-এস্টেটের কাজ সেরে রাজেশ যখন কার্শিয়াং যাবার জন্য ওর গাড়িতে স্টার্ট দিল তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। যে সময়কার কথা বলছি, তখন শুকনা ফরেস্ট থেকে ওই সমস্ত অঞ্চলের পুরোটাই ছিল গভীর বনময়। বেলা গড়ালে লোকজনের চলাচল একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত। কেননা বন্যজন্তুদের ভয়ও তখন ছিল খুব।

মার্চের প্রথম সপ্তাহ। তবুও হাড়-কাঁপানো শীত এখানে। কারণও আছে। গত কয়েকদিন ধরে যখন-তখনই হঠাৎ করে বৃষ্টি হচ্ছে পাহাড়ে। রাস্তার অবস্থাও খুব একটা ভাল নয়। ড্রাইভিং-এর ব্যাপারে রাজেশ খুবই দক্ষ। তাই বেশ সাবধানেই গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চলল সে।

শুকনা ফরেস্ট পার হতেই রাজেশ দেখল আকাশ-জোড়া কালো মেঘে দিক ছেয়ে গেছে। এ পথে বৃষ্টির কোনও সময়-অসময় নেই। তবুও ও তাড়াহুড়ো না করে শান্ত সংযতভাবেই ড্রাইভ করতে লাগল।

শিমুলবাড়ি টি-এস্টেট পার হতেই এত জোরে বৃষ্টি নামল যে আর এগোতে সাহস করল না রাজেশ। বাধ্য হয়েই এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে বৃষ্টি থামার অপেক্ষা করতে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে এক নেপালি তরুণী ছুটতে ছুটতে ওর গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল, 'আপনি কি কার্শিয়াং-এর দিকে যাচ্ছেন?'

রাজেশ বলল, 'হ্যাঁ।'

'অনুগ্রহ করে আমাকে আপনার গাড়িতে নেবেন?'

তখন এখনকার মতো এমন খারাপ দিনকাল ছিল না। তাই অচেনা কাউকে সঙ্গে নিতে ভয়ও পেত না কেউ।

রাজেশ বলল, 'নিশ্চয়ই নেব। আগে আপনি গাড়িতে উঠুন। একেবারেই ভিজে গেছেন দেখছি।'

তরুণী জল সপসপ শরীরে পিছনের সিটে গিয়ে বসল। তারপর বলল, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। সত্যি, এই দুর্যোগের মুহূর্তে আপনি না থাকলে কী যে হত।'

রাজেশ বলল, 'আপনি যাবেন কতদূর?'

'আমিও কার্শিয়াংয়েই যাব।'

'ভালই হয়েছে। দু'জনে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। আমার নাম রাজেশ গুপ্তা। আপনার নামটা জানতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই পারেন। আমি সুচেতা তামাং।'

আর কোনও কথা নয়। দু'জনেই চুপচাপ। তরুণী সুন্দরী। তাই ওর সান্নিধ্য ভালই লাগল রাজেশের। একটু পরে বৃষ্টি যখন কমল, সন্ধের অন্ধকারে তখন ভরে উঠল চারদিক।

রাজেশ বলল, 'এবার গাড়িতে স্টার্ট দিই?'

তরুণী হেসে বলল, 'যা আপনার ইচ্ছা। না হলে এভাবে তো সারারাত গাড়িতে থাকা যায় না।'

অতএব গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চলল রাজেশ।

বেশিদূর যেতে হল না, এবার অল্প বৃষ্টির হাত ধরে শুরু হল শিলাবৃষ্টিও। তবে বড় বড় গাছের তলায় থাকায় উইন্ডস্ক্রিনের কোনও ক্ষতি হল না।

অল্প সময়ের মধ্যে শিলাবৃষ্টি থেমে গেলে খুব সন্তর্পণে গাড়ি নিয়ে এগোতে লাগল রাজেশ। এমন দুর্যোগ হবে জানলে গুলমা থেকে মধুবনেই ফিরে যেত ও। এখন ভালয়-ভালয় পৌঁছতে পারলে হয়।

গাড়ি যখন ঘন জঙ্গলে ভরা রোহিণীতে এসে পৌঁছল, তরুণী হঠাৎ বলল, 'আর এগোবেন না প্লিজ। একটু এগোলেই বিপদ। আমাকে এখানেই নামিয়ে দিন। আপনিও নামুন। রোহিণীতে এক রাত থেকে কাল সকালে যেখানে ইচ্ছে যান।'

রাজেশ সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামাল। এবার একটু ভয়ও পেল মনে। রাতের

অন্ধকারে পার্বত্য রোহিণীতে সম্পূর্ণ অচেনা এই তরুণী কেন ওকে নামতে বলছে? সুচেতা নামের এই তরুণী তাহলে কে? রাজেশের সঙ্গে ও তো কার্শিয়াংয়েই যেতে চেয়েছিল। পথে বিপদের সম্ভাবনা আছে জেনেও কেন তাহলে এ পথে এসেছিল ও?

তরুণী গাড়ি থেকে নেমে বলল; 'গাড়িটা একটা সাইড করে রেখে আপনিও আসুন আমার সঙ্গে।'

রাজেশ গাড়ি থেকে না নেমেই বলল, 'কার্শিয়াং আমাকে যেতেই হবে। আপনিও তো সেখানেই যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কী হল আপনার যে এভাবে নিজে নেমে আমাকেও নামতে বলছেন। তা ছাড়া এই অচেনা জায়গায় রাতে আমরা থাকবই বা কোথায়?'

'এখানে রোহিণী মায়ের মন্দিরের কাছে আমার চেনাজানা অনেকেই আছেন। কোথাও না কোথাও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তা ছাড়া আপনি কি জানেন না রাতের অন্ধকারে এ পথে গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ। এতটা পথ যে এলেন, আপ-ডাউন কোথাও কোনও গাড়ির যাতায়াত দেখতে পেলেন?'

রাজেশ বলল, 'তা অবশ্য পাইনি। তবে কার্শিয়াং এখান থেকে খুব একটা দূরের পথ নয়। আমি ঠিকই চলে যেতে পারব। বিপদের ভয় আমি করি না। আপনি যদি এখানেই থাকতে চান তো থাকুন।' বলে একটু জোরেই গাড়ি চালিয়ে এগিয়ে গেল রাজেশ। রহস্যময়ী ওই তরুণীর খপ্পর থেকে যে বেঁচেছে এতেই স্বস্তি পেল ও।

রোহিণী থেকে একটু এগিয়ে একটা খাড়ামুখে এসে হঠাৎই ব্রেক কষল রাজেশ। সর্বনাশ! আর একটু হলেই বিপর্যয় একটা হয়েছিল আর কী। দেখল সামনেই একটা বিরাট ধস। পাশের একটি পাহাড় ধসে পথ একেবারেই রুদ্ধ করে দিয়েছে। এই অবস্থায় আর একটুও এগনো অসম্ভব।

রাজেশ ভেবে পেল না এখন সে কী করবে? এই নির্জন বনভূমে কুটিল অন্ধকারে গাড়িতেই বসে থাকা ছাড়া আর তো কোনও উপায়ই নেই। সুচেতা নামের ওই তরুণীকে অবিশ্বাস করে কেন যে শুনল না ওর কথা সে কথাই এখন বারবার মনে হতে লাগল ওর। সত্যি, কী ভুলই না করল। আবার এও ভাবল, নির্জন শিমুলবাড়ি থেকে ওর যাত্রাসঙ্গিনী হয়ে এতটা পথ পার হয়ে

রোহিণীতে এসেই তরুণী আগাম এই বিপর্যয়ের কথা জানতে পারল কী করে? ভেতরে ভেতরে ও কি তবে জ্যোতিষচর্চা করে? কে জানে?

অনেকটা সময় পার হবার পর রাজেশ মনে করল এইভাবে সারারাত এখানে পড়ে না থেকে ওর এখন রোহিণীতেই ফিরে যাওয়া উচিত। এই ভেবে একটু পিছিয়ে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে আবার রোহিণীতেই এল ও। এসে দেখল খর্বাকৃতি এক নেপালি যুবক আলো হাতে দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে।

রাজেশ যুবককে বলল, 'তোমাদের এই রোহিণীতে কোথাও না কোথাও এক রাতের মতো আমার কি একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা হতে পারে?'

'হতে পারে কেন, হয়ে আছে। আপনার জন্যই তো আমি অপেক্ষা করছিলাম। জানতাম আপনি ফিরে আসবেন।'

'কী করে জানলে? ওই সুচেতা দিদিমণি নিশ্চয়ই আমার কথা বলেছে তোমাকে?'

যুবক সে কথার উত্তর না দিয়ে লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখিয়ে ওর আগে আগেই চলতে লাগল। অনভ্যস্ত রাজেশও ওর সঙ্গ নিয়ে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলল।

এইভাবে অনেকটা পথ পার হবার পর রোহিণী মায়ের মন্দিরের কাছাকাছি একটি কাঠের চালাঘরের সামনে এসে যুবক বলল, 'এই আপনার ঘর। এখানেই আপনি থাকবেন।' বলে কোনও দিকে না তাকিয়ে হন হন করে কোথায় যেন চলে গেল।

দরজায় শিকল দেওয়া ছিল। অন্ধকারে সেই শিকল খুলে ঘরে ঢুকতে দেখল অন্য একটি লণ্ঠনের আলোয় ঘর একেবারে ভরে আছে। ছোট্ট একটি তক্তপোশে পরিপাটি করে বিছানা করা। ওয়ার দেওয়া মোটা একটি লেপও আছে গায়ে দেওয়ার জন্য। একপাশে সরু একফালি জায়গার মধ্যে বাথরুম। রাজেশের একা থাকার পক্ষে ঘরখানি খুবই উপযুক্ত ।

রাজেশ যখন দরজা বন্ধ করে শোবার জন্য তৈরি ঠিক তখনি দরজায় টক টক শব্দ করল কে যেন। সাড়া না দিয়ে দরজা খুলেই দেখল সুচেতা নামের লাস্যময়ী সেই তরুণী।

রাজেশের দিকে কেমন যেন চোখে তাকিয়ে তরুণী বলল, 'সারারাত না খেয়ে থাকবেন নাকি?'

'তা ছাড়া উপায়? এখানে কোথায় কী পাব বলুন? আপনি যে এখানে আমার একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এর জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

তরুণী একটা টিফিনক্যারি রাজেশের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এতে যা আছে তাতে আজ রাতের খাওয়া আপনার ভালভাবেই হয়ে যাবে।'

রাজেশ বলল, 'ধন্যবাদ।'

তরুণী বলল, 'আপনি তো বিপদকে ভয় পান না। আমার কথা কানেও না নিয়ে এগিয়ে গেলেন। তা কার্শিয়াংয়ে না গিয়ে এখানেই আবার ফিরে এলেন কেন?'

'ঠিক যে কারণে কার্শিয়াং যেতে গিয়ে আপনিও রয়ে গেলেন রোহিণীতে।'

তরুণী হেসে গড়িয়ে পড়ল।

রাজেশ আবার বলল, 'কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না আপনি আগেভাগে ওই ধসের ব্যাপারটা টের পেলেন কী করে?'

তরুণী মোহিনীর দৃষ্টিতে রাজেশের চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'বলব কেন?' তারপর কোনওরকম ছলাকলা না করে বলল, 'আমরা পাহাড়িরা অনেক কিছুই আগেভাগে টের পাই। আসলে পাহাড়ের এই অঞ্চলটা একটু ধসপ্রবণ। ক'দিন ধরে মাঝে মাঝেই বৃষ্টি হচ্ছে। তার ওপর আজ যা হল তাতে—।'

রাজেশ বলল, 'আশ্চর্য!'

তরুণী বলল, 'আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শুয়ে পড়ুন। রাত হয়েছে।'

তরুণী বিদায় নিলে ওর নিয়ে আসা সামান্য ডাল-রুটি খেয়ে শুয়ে পড়ল রাজেশ। শিলাবৃষ্টির প্রভাবে শীতটা বেশ জাঁকিয়েই পড়েছিল। তাই লেপটাও গায়ে চাপা দিতে ভুলল না।

শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে এপাশ-ওপাশ করল রাজেশ। তরুণীর মিষ্টি মুখখানি ওর মানসপটে ভেসে উঠতে লাগল বারবার। ও যে শুধু রহস্যময়ী তা নয়, ছলনাময়ীও। তবে ওর মধুর ব্যবহার ও আন্তরিকতায় রাজেশের মন ভরে গেছে। ওর কথা ভাবতে ভাবতেই একসময় ঘুমিয়ে পড়ল ও।

প্রায় মধ্যরাতে একটা চাপা কান্নার স্বর শুনে ঘুমটা ভেঙে গেল রাজেশের। মেয়ে গলার কান্না। এই পার্বত্য প্রদেশে বনময় স্থানে এভাবে কে কাঁদে?

রাজেশ শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। দরজা খুলে আলো হাতে বাইরে উঁকি মেরে দেখল চারিদিক ঘন অন্ধকারে ঢাকা। কিন্তু আশপাশে কেউ কোথাও নেই। দুর্যোগ কেটে গিয়ে আকাশও বেশ পরিষ্কার। কান্নার শব্দটাও ক্রমশ দূরের দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, ও দরজা বন্ধ করে আবার শয্যা গ্রহণ করল। শুধু ভেবে পেল না এত রাতে এমন করুণ স্বরে কেঁদে গেল কে?

আর ঘুম এল না রাজেশের। চারদিক থেকে অসংখ্য বন্য প্রাণীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগল ওর কানে। এখন শুধু সকাল হওয়ার অপেক্ষা। দিনের আলো ফুটে উঠলেই কার্শিয়াং যাওয়ার আশা ত্যাগ করে ফিরে যাবে মধুবনে।

অনেকটা সময় পার হয়ে যাওয়ার পর রোহিণীর মন্দির থেকে ঘণ্টার শব্দ শুনে দরজা খুলে বাইরে এল রাজেশ। আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝল ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। এমন সময় হঠাৎই চোখে পড়ল শাল-সোয়েটার গায়ে জড়িয়ে মাফলার টুপিতে কান মাথা ঢেকে জনা আষ্টেক তরুণী পূজার ডালি নিয়ে মন্দিরের দিকে চলেছে। স্পষ্ট করে তাদের কারও মুখ দেখা যাচ্ছে না। ওদেরই ভেতর থেকে কে যেন বলল, 'এই ঠান্ডায় এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যদি মন্দিরে যান তো চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিন। ঘরে একটা চাদরও রাখা আছে।'

এ তো সুচেতার গলা। এই অষ্টসখীর দলে ও-ও আছে জেনে খুব ভাল লাগল ওর। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর থেকে চাদরটা নিয়ে গায়ে জড়িয়ে বাইরে এল। বাইরে তখন হাড় হিম করা ঠান্ডা। তবুও সেই ঠান্ডাকে অগ্রাহ্য করে জোরে পা চালিয়ে ওদের সঙ্গ নিয়ে রোহিণীর মন্দিরে এল রাজেশ।

নবযৌবনসম্পন্ন এক জ্যোতির্ময় নেপালি ব্রাহ্মণ ঘণ্টা নেড়ে আরতি করছিল তখন। রাজেশ যেতেই ফিরে তাকিয়ে আড়চোখে একবার দেখে নিল ওকে। তারপর আবার আরতি করতে লাগল দেবী মূর্তির।

আরতি শেষ হলে সেই অষ্টসখী মাফলার টুপি আবরণ সরিয়ে অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠস্বরে ওদের ভাষায় দেবী বন্দনা করতে লাগল। সে এমনই সুর যে মন যেন ভরে গেল রাজেশের। বন্দনা শেষ হলে প্রণাম পর্বের পর ওরা যখন উঠে দাঁড়াল তখন বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না। তার কারণ ওদের

সবাইকেই একইরকম দেখতে। সুচেতা নামের সেই অনিন্দ্য সুন্দরী যেন আটভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। ওরা রাজেশের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনও কথা না বলে একটু মুচকি হেসে একজোটে বিদায় নিল।

রাজেশের মুখেও কোনও ভাষা এল না। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকার পর রাজেশ বুঝল সেই ব্রাহ্মণও কখন যেন বিদায় নিয়েছে। ও আর বসে না থেকে বাইরে এসেই দেখল সেই অষ্টসখীর দল অনেক দূরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

রাজেশ উদ্ভ্রান্তের মতো সুচেতা-সুচেতা করে ওদের দিকে এগিয়ে গেলে সেই অষ্টসখীও ভোজবাজির মতো এক এক করে একজনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। তারপর সেই একজনও আবছা অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল একসময়।

রাজেশের চোখেও তখন অন্ধকার। এ কি বাস্তব না অন্য কিছু? ওর বুকের ভেতর দারুণ একটা ভয় যেন জমাট বেঁধে গেল। কোনওরকমে পা চালিয়ে ও আবার ওর আশ্রয়স্থলের দিকে গেল। কিন্তু গেলে কী হবে অনেক চেষ্টা করেও সেই জায়গাটিকে আর খুঁজে পেল না। ও যখন হন্যে হয়ে এদিক-সেদিক করছে ঠিক তখনই সেই জ্যোতির্ময় ব্রাহ্মণ এগিয়ে এল ওর দিকে। তারপর হাসি মুখে বলল, 'খুব ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে। ঘর খুঁজছেন তো? ওই দেখুন ঘর। ওখানেই আপনি ছিলেন। আগে ওটা আমার ছিল। এখনকার মতো আপনার।'

রাজেশ এতক্ষণে ওর আশ্রয়স্থল খুঁজে পেল। কিন্তু ফিরে তাকিয়ে সেই ব্রাহ্মণকেও আর দেখতে পেল না। ও তখন ঘরে এসে দরজা বন্ধ করেই লুটিয়ে পড়ল বিছানার ওপর।

অনেক পরে দিনের আলো ভালভাবে ফুটে উঠলে দরজায় টকটক শব্দ শুনে দ্বার খুলে দিল রাজেশ। ঘরে ঢুকল লাস্যময়ী সুচেতা। দেখা মাত্রই গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল ওর।

সুচেতা বলল, 'হল কী আপনার! ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে?'

রাজেশ বলল, 'পেয়েছিই তো। এখন ঠিক করে বলুন আপনি কে? রাতের অন্ধকারে ওইভাবে ইন্দ্রজাল কি না দেখালেই চলত না?'

সুচেতা হেসে বলল, 'কী সব ভুলভাল বকছেন? রাতের খাওয়া আপনার

মনোমতো হয়নি নিশ্চয়ই? না হবারই কথা। প্রস্তুতি তো ছিল না। তাও আমার নিজের নয় অন্যের ঘরের খাবার। এখন আসুন চা-পর্বটা সেরে নেওয়া যাক। যে ক'দিন না ধসমুক্ত হয় সে ক'দিন এখানেই থাকতে হবে আমাকে। আপনি বরং আপনার ডেরাতেই ফিরে যান।'

'তা তো যাব, কিন্তু কালকের ব্যাপারটা?'

'কীসের কী ব্যাপার?'

রাজেশ তখন সব বলল।

সব শোনার পর সুচেতা মৃদু হেসে বলল, 'এবার বুঝেছি গোলমালটা কোথায়। আসলে আপনি যাকে দেখেছেন সে আমি নয়, নিকিতা। আমার প্রিয় বান্ধবী নিকিতা লিম্বু।'

'আমি তো একজনকে দেখিনি, একসঙ্গে আটজনকে একই চেহারায় দেখেছি।'

'তাহলেই বুঝুন। যা দেখেছেন তা সবই ওর মায়ারূপ। এই প্রচণ্ড ঠান্ডার দেশে অত ভোরে অন্ধকারে এখানে কোনও পূজোপাঠ বা মঙ্গলারতি হয় না।'

'আর এই পূজারি ব্রাহ্মণ?'

'সবই ছায়াময়। নিকিতা এই গ্রামেরই মেয়ে। পূজারি ব্রাহ্মণও এখানকার। যে ঘরে আপনি আছেন এই ঘরেই থাকতেন তিনি। যাক সে সব কথা। বছর তিনেক আগে এক সন্ধ্যায় প্রবল ধসের কবলে পড়ে এই গ্রামের আরও কয়েকজনের সঙ্গে ওদের পরিবারসহ সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তারপর থেকে রাতের অন্ধাকারে কখনও-সখনও নিকিতা ও তার প্রণয়ী ব্রাহ্মণকে কেউ কেউ ছায়া শরীর নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখলেও ওরা কাছে আসে না। নিকিতার মায়ের অশরীরীর আত্মাও সময় বিশেষে কেঁদে বেড়ায়। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না নিকিতা ওইভাবে বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে আমার রূপ নিয়ে আপনাকে দেখা দিল কেন? আমি যেমন ওকে ভুলিনি ও-ও কি তেমনই আমাকে ভোলেনি? এমন হলে তো এই রোহিণীতে আমারও আর আসা হবে না।' তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'সেই দুর্যোগের রাতে আমি এখানেই ছিলাম কমলাদের বাড়িতে। সেই থেকে আমি মেঘ দেখলে শিউরে উঠি। ঝড়-বৃষ্টিতে ভয়

পাই। এসব অঞ্চলে বৃষ্টি হলেই ধস নামে। তাই আপনি কার্শিয়াং যাচ্ছেন দেখে এক অজানা আশঙ্কায় আমি আতঙ্কিত হয়ে আপনাকে যেতে মানা করলাম। আপনি আমার কথা শুনলেন না। চলে গেলেন। কিন্তু আমার মন বলছিল আপনি বিপদের মুখে পড়বেন এবং ফিরে আসবেন। সে জন্যই বাহাদুরকে পাঠালাম আপনাকে পথ চিনিয়ে এখানে নিয়ে আসার জন্য। এটা ওই পূজারি ব্রাহ্মণের ঘর। ওঁর অন্তিমদশার পর থেকে এ ঘরে কেউ না থাকলেও এখানকার মেয়েরা সবসময় ঘর পরিষ্কার রাখে। কারও বাড়িতে হঠাৎ কেউ এসে পড়লে তাকে থাকতেও দেওয়া হয়। যেমন আপনাকে দেওয়া হয়েছে। তবে কাল রাতে যা ঘটল তা কিন্তু এর আগে আর কখনও হয়নি। আপনার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই বলুন, আপনি ওদের ছায়াশরীর দেখতে পেলেন। ওরা আপনাকে দেখা দিলেও আপনার কোনও ক্ষতি করেনি। নিকিতা ছিল খুব ভাল মেয়ে। ও রোজই সাজি ভরতি করে ফুল তুলে ব্রাহ্মণকে দিত। ওদের মধ্যে একটু প্রীতির সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। গান গেয়ে দেবীর আরাধনা করত নিকিতা। ব্রাহ্মণও নিষ্ঠার সঙ্গে সেবাপূজা, আরতি করত। সব শেষ হয়ে গেল।'

রাজেশ বলল, 'বুঝেছি। কাল রাতে আমি তাহলে রোহিণীতে এসে রাতমোহিনী দেখেছি।'

সুচেতা বলল, 'ঠিক তাই। তবে নিকিতার মধ্যে আমার রূপ দেখেছেন বলে আমাকেও যেন ওরকম কিছু ভাববেন না। আমি আমার মা-বাবার একমাত্র আদরিণী। কার্শিয়াং-এ টয়ট্রেনের স্টেশন ইয়ার্ডেই আমাদের বাড়ি। আবার যদি কখনও এদিকে আসেন, আমার কথা যদি মনে পড়ে, তাহলে অবশ্যই দেখা করবেন। আমার নাম সুচেতা তামাং।'

এরপর আর কোনও কথা নয়। সুন্দরী সুচেতার সঙ্গে ওর বান্ধবীর বাড়িতে এসে মুখ-হাত ধুয়ে চা-পর্ব সেরে আবার আসব বলে বিদায় নিল রাজেশ। সকালের সোনার রোদে চারদিক তখন ঝমল করছে। রাজেশের মনে আর কোনও শঙ্কা নেই। ও গাড়িতে বসে স্টার্ট দিয়ে খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে নেমে চলল মধুবনের দিকে।

মায়ামাধুরী

মুঙ্গেরে গঙ্গার ধারে বহুদিনের একটি পুরনো বাড়ি পঞ্চাশ বছর আগেও দেখা যেত। গঙ্গার ভাঙনে এখন সেই বাড়ির আর কোনও অস্তিত্বই নেই। বিরাজের দাদামশাই জামালপুরের স্টেশনমাস্টার ছিলেন। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর খুব কম দামে এই বাড়িটি তিনি কিনে নেন। সেই সময় এদেশে বাঙালিদের আধিপত্য ছিল খুব। বহু বাঙালির বাস ছিল ভাগলপুর, জামালপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি অঞ্চলে। আর জলহাওয়াও ছিল খুব ভাল। যে বাড়িটি দাদামশাই কিনলেন সে বাড়ির মালিক ছিলেন বেহালা অঞ্চলের এক বিত্তবান বাঙালি। তাঁর দুই ছেলে প্রবাসী হওয়ায় তিনি এখানকার পাট চুকিয়ে কলকাতাতেই পাকাপাকি ভাবে থাকা শুরু করলেন। মুঙ্গেরের এই বাড়িটা তাই পরিত্যক্ত হয়ে রইল।

বিরাজের দাদামশাই বাড়িটি জলের দামে মাত্র তিন হাজার টাকায় কিনেছিলেন। বাড়িটির একটি নামও ছিল—মায়ামাধুরী। কেন যে এই বাড়ির নাম এমন হয়েছিল তা কে জানে? দাদামশাই কিন্তু বাড়ি কেনার পর এই নামই বহাল রেখেছিলেন। কেন না নামটি তাঁর মনে ধরেছিল।

বাড়ি কেনার পর বিরাজরা মাত্র একবারই এসেছিল এই বাড়িতে। বিরাজের বয়স তখন চোদ্দো কি পনেরো। বাড়িটি দোতলা। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এর চারদিক। বাড়ির পিছনে বাগান। সেই বাগানে আম, জাম, কাঁঠাল-সহ বেশ কিছু ফলের গাছ। টগর, কামিনি, গন্ধরাজ, চাঁপা ইত্যাদি ফুলের গাছও আছে। বাড়িটি ছিল বিরাজের মনের মতো। হাওড়া শিবপুরের ছেলে

ও। এই সুন্দর পরিবেশে গঙ্গাতীরের শোভা সৌন্দর্যে মন তার একেবারেই মজে গেল। প্রায় দিন পনেরো ছিল ওরা। তারপর একসময় চলে যেতেই হল। বাবার অফিস, নিজের স্কুল পড়াশোনা এসব তো বজায় রাখতেই হবে। তাই অনেক আনন্দে মন ভরিয়ে আবার ফিরে এল স্বভূমে।

এরপর বেশ কতকগুলো বছর কোথা দিয়ে যেন কেটে গেল। দাদু-দিদার সঙ্গে চিঠিপত্রেই যা কুশল বিনিময় হত। বিরাজের মা বারবার বলতেন, 'তোমাদের বয়স হয়েছে। আর ওখানে না থেকে বাড়ি বিক্রি করে চলে এসো এখানে।'

দাদামশাই অবশ্য মায়ের কথা শুনতেন না। গঙ্গার ধারে অমন একটি বাড়ির মোহ ছেড়ে কি আসা যায়? তবে হঠাৎই একদিন মায়ের অসুখের খবর পেয়ে দু-জনেই এসে হাজির হলেন শিবপুরে। বাড়ি অবশ্য একেবারে ফাঁকা রেখে আসেননি। বনমালী নামে স্থানীয় একজন লোককে বাড়ি দেখাশোনার ভার দিয়ে তবেই এসেছিলেন। তবে এই আসাই তাঁদের শেষ আসা। কয়েকদিন পরে মা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেও সামান্য একটু জ্বর ভোগের পর দাদু-দিদা দু-জনেই প্রয়াত হলেন। মৃত্যুর আগে মেয়ের হাতে সিন্দুকের চাবি দিয়ে দিদা বলে গেলেন, 'তোকে তো যা দেওয়ার দিয়েইছি। এছাড়াও আরও কিছু গয়নাপত্তর আছে আমার। কিছু ফিক্সড ডিপোজিট আর ব্যাংকের পাস বই আছে তোর ছেলের নামে নমিনি করা। ওগুলো যাতে নষ্ট না হয় তা দেখিস। নগদ কিছু টাকাও আছে। আর পারলে বাড়িটা বিক্রি করে দিস।'

দাদু-দিদার মৃত্যুর পর কাজকর্ম সব মিটে গেলে বিরাজ একদিন গোরা নামে ওর এক বন্ধুকে নিয়ে শিয়ালদা থেকে আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসে রওনা হল জামালপুরের দিকে। ঝাঁঝার কাছে তুফান মেলে সেবার ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর থেকে দিল্লির গাড়ি আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন হয়। সেইসময় অবশ্য রিজার্ভেশন সিস্টেম চালু হয়নি। আর ট্রেনে এখনকার মতো এত ভিড়ভাট্টাও হত না। তাই ট্রেনে উঠে দু'জনে দুটো মুখোমুখি বাঙ্ক দখল করে যাত্রা শুরু করল।

দেশে তখন ভাল সরকার ছিল। রেলে প্রশাসন বলে একটা ব্যাপার ছিল।

রেল কর্মচারীরাও ছিল সৎ। কাজে ফাঁকি দিত না। তাই পরদিন বেলা দশটা নাগাদ নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন এসে থামল জামালপুরে।

জামালপুর স্টেশনের পাশেই ভীষণদর্শন কালীপাহাড়। ঘন অরণ্যে ভরা। বাঘ, ভালুকেরও উপদ্রব ছিল খুব। পনেরো বছর বয়সে বিরাজ প্রথম এসেছিল এখানে। এখন ওর বাইশ বছর বয়স। গোরারও তাই। দু-জনেই কলেজ পড়ুয়া যুবক। এখানকার প্রকৃতি দেখে বুক কেঁপে উঠলেও ভাল লাগল খুব।

ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের বাইরে এসে একটা দোকানে বসে চা পর্বটা সেরে নিল ওরা। তারপর একটা টমটম গাড়ি ভাড়া করে চলে এল গঙ্গার ধারে। এদিকে বসতি তখন খুবই কম। তবু দু-চারজনকে জিজ্ঞাসা করে মায়ামাধুরীতে হাজির হল ওরা। কিন্তু এসে দেখল দরজায় তালা। যদিও বাড়ি চিনতে ভুল হয়নি বিরাজের। পুরনো দিনের সেই স্মৃতি কি ভোলা যায়? কিন্তু দরজায় তালা কেন? বনমালী নামে একজনের তো থাকার কথা।

বিরাজ বলল, 'সর্বনাশ! আমার কাছে তো আলাদা কোনও চাবি নেই। এখন ঘুরে ঢুকব কী করে?'

গোরা বলল, 'একটু ওয়েট কর না। লোকটা হয়তো কোথাও গিয়েছে কিছু কেনাকাটা করতে।'

কিন্তু না। প্রায় চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করার পরও যখন কেউ এল না, তখন ওরা তালা ভাঙার জন্য ইট-পাথর কিছু খুঁজতে লাগল। এমন সময় হঠাৎই কোথা থেকে যেন একটা চাবির গোছা ঝনাৎ করে পড়ল ওদের পায়ের কাছে। দেখল এক তরুণী চাবিটা ওদের দিকে ছুড়ে দিয়েই হন হন করে উধাও হয়ে গেল। তরুণী যে কে, এই চাবি কী করে এল তার কাছে কিছুই ভেবে পেল না বিরাজ।

যাইহোক, ওরা তালা খুলে ভেতরে ঢুকল। ঘর-দোরের অবস্থা দেখে বুঝল বহুদিন ঝাঁটপাট পড়েনি এখানে। বনমালী তাহলে গেল কোথায়? দাদু-দিদা বিদায় নেওয়ার পর সেকি তার দায়িত্ব পালন করেনি?

কেউ কিছু করুক না করুক এখন নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। ওরা দোতলার একটা ঘরের তালা খুলে নিজেদের মালপত্তর রেখে কীভাবে কী করা যায় তাই নিয়ে চিন্তা করতে লাগল।

বিরাজ বলল, 'তুই একটু বোস গোরা, আমি বাইরে বেরিয়ে দেখি এখানকার কাজকর্ম করে দেওয়ার জন্য কাউকে পাওয়া যায় কিনা। অমনি বনমালীর ব্যাপারেও একটু খোঁজখবর নিয়ে আসি।'

বিরাজ বাইরে এসে দেখল, একজন বয়স্কা মহিলা এই বাড়ির দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন। বিরাজকে দেখে বললেন, 'এ বাড়ির কর্তা গিন্নি ফিরে এসেছেন বুঝি? তুমি ওঁদের কে হও?'

বিরাজ বলল, 'আমি ওঁদের একমাত্র নাতি। আমার দাদু-দিদা দু-জনে একমাস আগে গত হয়েছেন। তা ওঁরা বানমালী নামে একজনকে রেখে গিয়েছিলেন, সেই লোকটা গেছে কোথায় বলতে পারেন?'

'সে এক রাত ওই বাড়িতে থেকেই পালিয়েছে বাবা। ওই পোড়ো ভূতের বাড়িতে কেউ বাস করতে পারে? ও যেই ওদের অস্তিত্ব টের পেয়েছে অমনি ঘরের চাবি ওই ওদিকের গোয়ালাদের বাড়িতে দিয়ে ওর দেশের বাড়ি মিথিলায় চলে গেছে। তা বাবা, তোমরা চাবি পেলে কার কাছে?'

'কোথা থেকে যেন এক মেয়ে এসে চাবিটা ছুড়ে দিয়ে চলে গেল।'

'বুঝেছি, বাসনা এসেছিল। খুব ভাল মেয়ে। তা বাবা, তুমি একা এসেছ না সঙ্গে আর কেউ আছে?'

'আমার এক বন্ধুও আছে সঙ্গে।'

'এই ভূতের বাড়িতে তোমরা থাকতে পারবে?'

বিরাজ বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'ভূতের বাড়ি! কই একথা আগে কখনও শুনিনি তো? তা ছাড়া আমার দাদু-দিদা প্রায় আট-দশ বছর কাটিয়ে গেলেন এই বাড়িতে। তাঁদের মুখেও তো শুনিনি কিছু। কখনও কোনওরকম ভয় পাননি ওঁরা।'

'কী করে পাবেন? ওঁরা যে নিত্য পুজোপাঠ করতেন, হোম-যজ্ঞ করতেন। তাই কিছু টের পাননি। এর আগে যে মালিক ছিলেন পেসাদবাবু, তিনি অবশ্য বছরে একবার কি দু-বার আসতেন। দু-তিন মাস থাকতেন। তোমার দাদু-দিদা যেমন বনমালীকে রেখেছিলেন তিনিও তেমনই প্রভুদেব নামে মিশ্র পরিবারের এক ব্রাহ্মণকে রেখেছিলেন এ বাড়ির বিগ্রহের সেবা পূজার জন্য। কী সুন্দর দেখতে তাকে। তা হঠাৎ একদিন কী যে ভাব এল তার

মনে, ওই বাগানের কোণে যে চাঁপা গাছটা আছে তারই ডালে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ল।'

বিরাজ চমকে উঠল, 'সেকি! সুইসাইড করল?'

'মনে হয় বাবুর দুই মেয়ে মায়া ও মাধুরীকে নিয়েই গোলমাল।'

বিরাজ বলল, 'বুঝেছি ওদের নামে তাহলে এই বাড়ির নাম। কিন্তু আমরা তো জানতাম ওই বাবুর দুই ছেলে প্রবাসী হওয়ায় উনি মনের দুঃখে বাড়ি বেচে দেন আমার দাদামশাইকে। ওঁর মেয়েদের কথা শুনিনি তো!'

'হ্যাঁ, ওঁর দুই ছেলে দুই মেয়ে।'

বিরাজ বলল, 'থাক, আপনি এক কাজ করুন, আমরা দু-বন্ধুতে এসেছি। আপনি কি আমাদের জন্য এমন একজন লোকের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন যে আমাদের রান্না থেকে জল তোলা বা অন্য সব কাজ করে দেবে?'

বলতে বলতেই দেখা গেল সেই তরুণী হনহন করে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

মহিলা বললেন, 'ওই তো বাসনা। বনমালী ওদের ঘরেই চাবি রেখে গিয়েছিল।'

বাসনা কাছে এলে মহিলা বললেন, 'জানিস তো এবাড়ির কত্তাবাবা ও কত্তামা দু-জনেই স্বর্গগত হয়েছেন।'

বাসনা বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'তাই।'

'হ্যাঁ, ইনি ওঁদের নাতি। দেখ না কাউকে পাস কিনা যে ওদের একটু রেঁধে-বেড়ে দেবে।'

বাসনা বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখছি। একটু আগে আমি ওদের দেখতে পেয়ে চাবি দিয়ে গেলুম। আমি ভাবলাম কত্তামা-রা বোধ হয় পরে আসবেন।' বলে বিরাজকে বলল, 'আপনি ঘরে যান। আমি কাউকে না কাউকে পাঠাচ্ছি।'

বিরাজ এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে এল।

এইটুকু সময়ের মধ্যে গোরা বেশ গুছিয়ে নিয়েছে ওদের শোবার ঘরটাকে।

বিরাজ এসে বলল, 'আর কোনও দুশ্চিন্তা নেই। সব ব্যবস্থা পাকা।'

গোরা বলল, 'সত্যি বিরাজ, তুই খুব ভাগ্যবান। তোদের এই বাড়িটা যেন প্রকৃতির এক স্বর্গোদ্যানে। সামনেই বয়ে চলেছেন মা গঙ্গা। আমাদের হাওড়া কলকাতার মতো ঘোলা জলের নয়। পরিষ্কার নীলজল। আমরা যে ক'দিন

এখানে আছি সে ক'দিন রোজ ওই গঙ্গায় স্নান করব। আর একটা অনুরোধ, তোরা যেন ভুলেও কখনও এই বাড়িটাকে বেচে দিস না। আমরাই বন্ধুরা মিলে যখন ইচ্ছে তখন এই বাড়িতে আসা-যাওয়া করব। তা ছাড়া বাড়ির লোকদের নিয়ে চেঞ্জেও আসব মাঝে মাঝে।'

গোরার কথা শুনে বিরাজ বলল, 'এই বাড়ি বিক্রি করার বাসনা আমারও নেই রে।'

'তা তোদের সেই বনমালীর কোনও খবর পেলি?'

বিরাজ গোরাকে আর সত্যি কথাটা বলল না। কারণ, যদি ও কোনও কারণে ভয় পায় তাই। তবু বলল, 'ও বোধহয় এ বাড়িতে আর ফিরবে নারে। হঠাৎ ওর দেশ থেকে একটা তার আসায় ও সেই যে গেছে আর ফেরেনি। যাওয়ার সময় বুদ্ধি করে চাবিটা এখানকার এক গোয়ালার বাড়িতে দিয়ে গেছে। আর বলে গেছে, ও যদি দেশ থেকে না ফেরে তাহলে চাবিটা যেন কত্তাবাবু, কত্তামা এলে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।'

'বুঝেছি। তখন যে মেয়েটা এসে চাবি দিয়ে গেল সে তাহলে ওই গোয়ালাদেরই মেয়ে।'

'হ্যাঁ, ওর নাম বাসনা। ওই আমাদের কাজের লোকের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।'

বিরাজের কথা শেষ হওয়ামাত্র নীচের দরজায় টক টক শব্দ। ওরা ওপর থেকে নীচে এসেই দেখল বাসনা এখানকার এক এদেশীয় মহিলাকে নিয়ে অপেক্ষা করছে। মহিলার গায়ের রং মাজা কালো। বয়স খুবই কম। চব্বিশ-পঁচিশের বেশি নয়। বিবাহিতা।

বিরাজ বাসনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই দিদিটাই বুঝি আমাদের কাজ করে দেবে?'

বাসনা বলল, 'হ্যাঁ, এ হল লছমিদিদি। খুব ভাল মেয়ে। তবে অভাবী খুব। আপনারা দিনে একটাকা করে ওকে দেবেন, কেমন? আর আপনাদের রাতের খাওয়ার ব্যবস্থাটা ও বিকেলের মধ্যেই করে দিয়ে চলে যাবে।'

বিরাজ বলল, 'আমাদের এখানে এতগুলো ঘর, উনি ইচ্ছে করলে এখানেও থাকতে পারেন। আমরা যে ক'দিন এখানে আছি, সে ক'দিনের জন্য নয়, বরাবরের জন্যই। ঘরভাড়া দিতে হবে না।'

বাসনা হেসে বলল, 'সে পরের কথা। তা ছাড়া আপনারা দু-জন যুবাপুরুষ যেখানে আছেন সেখানে একা কোনও মেয়ে কখনও থাকতে পারে? বিশেষ করে রাতের বেলা?'

বিরাজ বলল, 'না না, থাকাটা ঠিক হবে না। আমি অবশ্য ওদিকটা ভেবে দেখিনি।' তারপর লছমিকে বলল, 'লছমিদিদি, তুমি একটু ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘরে ঢুকে দেখো আমাদের কাজে লাগে এমন কোনও কিছু পাও কিনা।' বলে নীচের সব ঘরেরই দরজার তালা খুলে দিল।

বাসনা বলল, 'আমি তাহলে আসি?'

বিরাজ বলল, 'আসুন। আবার দেখা হবে।'

লছমিদিদি সব দেখেশুনে বলল, 'সামান্য কয়েক মুঠো চাল ছাড়া ঘরে কিছুই নেই গো দাদাবাবু। তবে স্টোভ জ্বালানোর মতো কেরোসিন আছে অনেকটা। তুমি এখানকার কিছুই চিনবে না। তুমি যদি আমাকে টাকা দাও তো আমিই সব কিনে আনতে পারি।'

বিরাজ বলল, 'ক'টাকা দেব বলো?'

'দশটা টাকা দেও না।'

বিরাজ টাকা দিলে লছমিদিদি দুটো ব্যাগ নিয়ে দোকান বাজার করতে চলে গেল।

লছমিদিদি চলে যাওয়ার একটু পরেই বাসনা এসে হাজির। মেয়েটিকে প্রথম দেখার পরেই দারুণ ভাল লেগেছে বিরাজের। যেন সাক্ষাৎ দেবী প্রতিমা। আর তেমনই মিষ্টি চোখ-মুখের আকর্ষণ।

বাসনা হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'অতিথিদের এখনও চা সেবা হয়নি নিশ্চয়ই? হবেই বা কী করে? ঘরে তো কিছুই নেই। তা আসুন না আমাদের বাড়িতে, চা করে খাওয়াব।'

এমন প্রস্তাব অবহেলা করার নয়। তাই দু-জনেই চলল বাসনাদের বাড়িতে চা খেতে।

মায়ামাধুরী থেকে বাসনাদের বাড়ি বেশ কিছুটা তফাতে। ওরা যেতে বাসনার মা ওদের দু-জনকে পুরনো ভাঙাচোরা বাড়ির দাওয়ায় বসিয়ে খুব যত্ন করে চা-মুড়ি খাওয়াল। ওদের জমি-জিরেত সব দেখাল। তারপর

বলল, 'যদি দুধের দরকার হয় তো বোলো, আমার মেয়ে গিয়ে দিয়ে আসবে।'

বিরাজ বলল, 'চায়ের জন্য দুধ তো লাগবেই। মাস খানেকের মতো আছি। এখানকার খাঁটি দুধ পেলে শরীর, স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।'

গোরা বলল, 'আমি অবশ্য অতদিন থাকব না। চার-পাঁচদিন থেকেই চলে যাব। আমার বোনের বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। তবে আমার বন্ধুটি থেকে যাবে। কেন না ওর অনেক কাজ এখানে। সবকিছু গুছিয়ে-গাছিয়ে যাকে হোক বাড়িতে বসিয়ে তবেই যাবে ও।

গোরার কথা শেষ হতেই বাসনার মা একবার তাকিয়ে দেখল বাসনার দিকে। বাসনাও একবার মাকে দেখল। এই দেখাদেখির ব্যাপারটা অবশ্য নজর এড়াল না বিরাজের। মনে একটু ভয়ও হল। কী ভাগ্যিস কোনও ভৌতিক ঘটনার কথা কিছু বলে বসেনি এরা।

চা-পর্ব শেষ হলে ওরা দু-জনে ফিরে এল মায়ামাধুরীতে।

ওরা যাওয়ার একটু পরেই লছমিদিদি এল। অনেক কিছু কেনাকাটা করে নিয়ে এসেছে। কাঁচা আনাজও এনেছে কিছু। যাইহোক, অভ্যস্ত হাতে বেশ তৎপরতার সঙ্গে গুছিয়ে নিল সবকিছু। বলল, 'ভাত, ডাল একটা তরকারি বানিয়ে দিচ্ছি। তোমরা ততক্ষণে গঙ্গায় গিয়ে চানটান করে এসো।'

গোরা বলল, 'তোমাদের এখানে খাট্টা দই পাওয়া যায় না?'

'কেন পাওয়া যাবে না। ওই একটু এগিয়ে বাজারে গেলেই পাবে।'

'ঠিক আছে, তুমি ততক্ষণ রান্না করো, আমি চট করে একটু দুই নিয়ে আসি।'

লছমিদিদি বলল, 'তোমাদের খাওয়াদাওয়া মিটলে আমি সব ঘরগুলো ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে দেব।'

'দুপুরে তুমিও আমাদের সঙ্গে খাবে কিন্তু।'

'সে তো খাবই। না হলে আর কোথায় খাব বলো।'

গোরা বাজারে গেলে বিরাজ বলল, 'ঘরে তোমার কে কে আছে লছমিদিদি?'

'আমার সোয়ামি আছে, ছেলেমেয়ে আছে। ওরা অবশ্য কেউই থাকে

না আমার কাছে। ছেলেমেয়ে দুটো খুবই ছোট। সীতাকুণ্ডের আশ্রমে জানকীমাতার কাছে মানুষ হচ্ছে ওরা। আর সোয়ামি দু-বছর আগে অসমে কাজ করতে গিয়ে আর ফেরেনি। আমি শুধু স্বামীর ভিটেটুকু আগলে পড়ে আছি।'

'সত্যিই তুমি খব ভাল মেয়ে। তা দিদি, আমাদের এই বাড়িতে তুমিই থেকে যাও না। তোমার ঘরটা কাউকে ভাড়া দিয়ে দাও।'

লছমিদিদি যেন একটু ভয় পেয়ে বলল, 'এ বাড়িতে একা থাকলে আমার খুব ভয় করবে দাদাবাবু।'

'কেন? কীসের ভয়?'

'এ বাড়ির অনেক বদনাম আছে। তোমাদের কত্তাবাবা-কত্তামা যে কী করে ছিলেন তা আমরা ভেবে পাই না। ওঁরা তো একজনকে রেখেও গিয়েছিলেন। তা মাত্র একরাত থেকেই ভয়ে পালিয়েছে সে।'

'কিন্তু ভয়টা কীসের?'

'এ বাড়ির এক বামুনঠাকুর বাগানের চাঁপা গাছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছিল। তারপরে ওই দুই দিদির একজন বিষ খেল আর একজন সাপ-কাটি হয়ে মরল। ওদের আত্মারা এই বাড়ির টান ছেড়ে কোথাও যেতে পারেনি। মাঝে মাঝে একে ওকে তাকে দেখা দেয়। রাত-বিরেতে বাড়িতে উপদ্রব করে।'

ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় মনে হল বিরাজের কাছে। ওর দাদু-দিদা এই বাড়িতে কত বছর বাস করলেন, ওরাও তো সেবার এসে প্রায় দিন পনেরোর মতো থেকে গেলে, কই কোনও কিছুই তো টের পায়নি ওরা। বাগানে সাজি হাতে ফুল তুলেছে, কেউ ওদের কোনও ভয় দেখায়নি। অথচ দাদু-দিদা এখান থেকে চলে যাওয়ার পরই যত সব উদ্ভট গল্প। নিশ্চয়ই কেউ জলের দামে বাড়িটা কিনবে বলে এইসব রটাচ্ছে।

বিরাজ বলল, 'ঠিক আছে। আমরা তো রয়েছি। এখন এ বাড়িতে, দেখাই যাক না কিছু হয় কী না হয়।'

'তোমরাও কিন্তু এখানে থাকতে পারবে না দাদাবাবু। আজকের রাতটুকু থাকো, তেমন কিছু হলে অন্য কোথাও চলে যেও।'

বিরাজ বলল, 'যদি তেমন কিছু হয় তাহলে তাই যাব। তবে এসব গল্প যেন আমার বন্ধুটির কাছে কোরো না।'

বিরাজ আর কথা না বলে বাড়ির বাইরে এসে পায়চারি করতে লাগল। ওর সবকিছুই যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে শুনল ব্রাহ্মণ যুবক প্রভুদেবের উদবন্ধনে আত্মহত্যার কথা। পরে শুনল আগের মালিকের ছেলে ছাড়াও দুই মেয়ের কথা। তাদের নাম মায়া ও মাধুরী। এখন লছমিদিদির মুখে শুনল ওই মেয়েদের একজনের বিষ খেয়ে মরার কথা, অপর জনের সাপকাটি হয়ে। হয়তো সত্যসত্যই এমন কিছু হয়েছে। তা এসব কথা কি দাদু-দিদা জানতেন না? কে জানে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে এই বাড়িতে।

একটু পরেই গোরাকে আসতে দেখা গেল কাঁচা শালপাতার ঠোঙায় দই নিয়ে। গোরার মুখ কেমন যেন গম্ভীর।

বিরাজ বলল, 'দই পেয়েছিস?'

'দেখতেই তো পাচ্ছিস শালপাতার ঠোঙায় দই আছে।'

'চল, তাহলে এবার গঙ্গায় গিয়ে স্নানটা করে আসি।'

গোরা কোনও সাড়াশব্দ করল না। তবে চটপট স্নানের জন্য তৈরি হল।

ওরা দু-জনে অনেকক্ষণ ধরে গঙ্গায় স্নান করল কিন্তু গোরার মনোভাবের কোনও পরিবর্তন হল না। কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে রইল সে।

বিরাজ বলল, 'হঠাৎ তুই এমন মিইয়ে গেলি কেন রে? কী হয়েছে তোর?'

গোরা বলল, 'তুই কিন্তু আমার কাছে অনেক কিছুই গোপন করেছিস।'

'কী ব্যাপারে বল তো?'

'তোদের এই বাড়িতে ভূতের উপদ্রব হয়। রাতে কেউ থাকতে পারে না।'

'ও সব মতলবি লোকেদের রটনা। তা যদি হয় তাহলে আমার দাদু-দিদা দীর্ঘদিন এই বাড়িতে বাস করলেন কী করে?'

'সে কথা তাঁরাই বলতে পারতেন। এখন তো তাঁরা নেই, তাই স্থানীয় লোকেরা যা বলেন সেটাই বিশ্বাস করতে হয়। আমি কিন্তু আর এক মুহূর্তও এখানে থাকব না। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সোজা চলে যাব জামালপুর। তারপর রাতের গাড়িতে বাড়ি।'

'এটাই কি তোর সিদ্ধান্ত?'

'হ্যাঁ। বাজারে না গেলে জানতেই পারতাম না এ বাড়ির গুপ্ত কথা।'

বিরাজ বলল, 'বেশ তো, যা ভাল বুঝিস কর। অযথা তোকে থাকতে বলে বিপদে ফেলব না। ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে যা তুই।'

এরপর দু-জনে ঘরে এসে দুপুরের খাওয়া সেরে নিল। ডাল, ভাত আর চিনি মাখিয়ে খাট্টা দই। খাওয়া-দাওয়ার পর খুব ব্যস্ততার সঙ্গে গোরা ওর ব্যাগপত্তর গুছিয়ে নিল। তারপর বিরাজের কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'কিছু মনে করিস না ভাই। ওইসবে আমার দারুণ ভয়, তাই বিদায় নিচ্ছি।'

বিরাজ হেসে বলল, 'কিছুই মনে করব না। মন যখন চাইছে না তখন না থাকাই ভাল। তা ছাড়া তুই না এলেও আমাকে তো আসতেই হত। হয়তো মা-ও আসতেন সঙ্গে। তবে সাবধানে যাস কিন্তু।'

গোরা বিদায় নিলে লছমিদিদি বলল, 'ওই দাদাবাবু চলে গেল?'

'হ্যাঁ। বাজারে কারা যেন ওকে ভূতের ভয় দেখিয়েছে তাই!'

'তুমি কি করবে?'

'আমি আমাদের বাড়ি ছেড়ে যাবই বা কোথায়? আমি থাকব। তুমি শুধু আমার জন্য খানচারেক রুটি করে দিয়ে চলে যাও। ডাল, তরকারি যা আছে তাতেই আমার রাতের খাওয়া হয়ে যাবে।'

এরপর সারাটা দুপুর, বিকেল পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে সন্ধের মুখে লছমিদিদিকে বিদায় দিয়ে গঙ্গার ঘাটে এসে বসল বিরাজ। এখানকার গঙ্গার শোভা সৌন্দর্য দেখে ও এমনই মোহিত হয়ে গেল যে ওর মনের মধ্যে কোনও আতঙ্কই স্থান পেল না।

সন্ধে উত্তীর্ণ হলে ও বাজারে গিয়ে এক কাপ চা খেয়ে রাতে রুটির সঙ্গে খাবার জন্য একটু মিষ্টি কিনে ঘরে ফিরল। ঘরে তো ফিরল। কিন্তু ঘর যে অন্ধকার। এখানে আলোর ব্যবস্থা কী হবে সে ব্যাপারে ওর খেয়াল ছিল না। ও যখন কী করবে ভাবছে ঠিক তখনই একটা হ্যারিকেন নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল বাসনা। বলল, 'আমি জানতাম এমনই হবে। তাই আলো নিয়ে এলাম আপনার জন্য। তা আপনার বন্ধুটি শুনলাম বিদায় নিয়েছেন।'

'হ্যাঁ। লোকে যা ভয় দেখিয়েছে। আর কখনও থাকে?'

'যাইহোক, আপনি না ভয় পেলেই হল। আমি চলে গেলে বাইরের

দরজাটায় খিল দিয়ে আসবেন। কারও ডাকে সাড়া দেবেন না। দরজা খুলবেন না।'

বাসনা চলে গেলে বিরাজ টর্চের আলোয় দরজার কাছ পর্যন্ত এসে খিল দিয়ে গেল। এত বড় বাড়িতে এই ভয়ংকর নির্জনে একা থাকতে একটু যে ভয় করল না ওর তা নয়, তবু কী আর করা যাবে? থাকতে তো হবেই। শুধু তো রাতটুকু। তারপর ওর মনের মতো মেয়ে বাসনার সঙ্গ নিয়ে কয়েকটা দিন বেশ ভালভাবেই কাটিয়ে দিতে পারবে।

সে রাতে বেশ কিছুক্ষণ শরৎবাবুর একটা বই পড়ে কাটাল ও। তারপর খেয়েদেয়ে ওপরে এসে আলোর শিখাটা একটু কমিয়ে শুয়ে পড়ল টান হয়ে। শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে বাসনার কথা ভাবতে লাগল। মনে মনে এও ঠিক করল ওর দিক থেকে যদি কোনও আপত্তি না থাকে তাহলে ওকেই ওর জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বেছে নেবে।

খুব ভোরে অজস্র পাখির কলকাকলিতে ঘুম ভাঙল বিরাজের। আকাশ তখনও ভালভাবে ফর্সা হয়নি। হ্যারিকেন নিভিয়ে ও টর্চ না জ্বেলেই বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তারপর গঙ্গার দিকে তাকাতেই মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে গেল ওর। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে বাইরের দরজা খুলতেই দেখল বাসনা ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। বলল, 'কী মহাশয়, কাল রাতে ভূতেরা আপনাকে গলা টিপে মেরে ফেলেনি তো?'

'মোটেই না। সত্যি, যা ভয় দেখাল সবাই। মাঝখান থেকে আমার বন্ধুটি ভয় পেয়ে পালাল।'

'এখন তাহলে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

'ওই একটু গঙ্গার ধার থেকে ঘুরে আসি। তুমি আসবে আমার সঙ্গে?'

বাসনা হেসে গড়িয়ে বলল, 'আমার কাজ নেই বুঝি? আমি শুধু দেখতে এলাম আপনি কতটা ভয় পেয়েছেন।' বলেই দ্রুত উধাও হয়ে গেল।

বিরাজ এরপর সূর্য ওঠার সময় পর্যন্ত গঙ্গার ধারে বসে থেকে যখন ঘরে ফিরল তখন দেখল, লছমিদিদি চারদিক ঝাঁটপাট দিয়ে স্টোভ নিয়ে বসে আছে।

বিরাজ যেতেই বলল, 'ওদিকে ঘড়া ভরতি জল আছে। ওই জল খাবে।

দুধ এলেই চায়ের জল বসাব। তা হ্যাঁ দাদাবাবু, কাল রাতে কোনও ভয়-টয় পাওনি তো?'

'না। কীসের ভয়?'

'ওই যে সবাই যা বলে।'

এইসব কথার মধ্যেই বাসনা এল দুধ নিয়ে। বলল, 'লছমিদিদি আমিও একটু চা খাব গো।'

বিরাজ বলল, 'তা তো খাবে। কিন্তু তখন তুমি ওইভাবে পালালে কেন?'

বাসনা যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, 'আমি! আমি তো এই আসছি।'

'চালাকি পেয়েছ? বললুম চলো একটু গঙ্গার ধার থেকে ঘুরে আসি।'

'আপনি স্বপ্ন দেখেছেন।'

'মোটেই না। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েই দেখি তুমি।'

বাসনা একটু সময় চুপ করে থেকে বলল, 'তবু ভাল যে রাতের অন্ধকারে আমাকে দেখেননি। কাল থেকে অত ভোরে না উঠে একটু বেলা করে উঠবেন কিন্তু।'

বিরাজ এবার বেশ বুঝতে পারল এ বাড়ির ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে যা রটনা তা মিথ্যে নয়। যাইহোক, ব্যাপারটা ও ভুলে যাবারই চেষ্টা করল।

চা-পর্ব শেষ হলে বাসনা বলল, 'একটু পরে আসুন না আমাদের বাড়ি। ভাল ঘিয়ের হালুয়া খাওয়াব। আর মাছ, মাংস খেতে চাইলে লছমিদিকে টাকা দিন, ও এনে দেবে।'

লছমিদিদি বলল, 'ও পাড়ার হাসিম বলছিল, বাবু যদি মোরগা খায় তো নিয়ে যা। বারো আনা দাম লাগবে।'

বিরাজ বলল, 'বেশ তো, তাই হোক না।' তারপর বাসনাকে বলল, একটা গোটা মুরগির মাংস তো আমরা দু-জনে খেয়ে শেষ করতে পারব না, তুমিও যোগ দাও না আমাদের সঙ্গে? গ্র্যান্ড পিকনিক একটা হয়ে যাবে তাহলে।'

বাসনা হেসে বলল, 'আমার আপত্তি নেই। এখন আপনি আসুন আমাদের বাড়ি। অমনি মাকেও বলে আসি। আমার মা কিন্তু আপনাকে খুব ভাল চোখে দেখেছেন।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। বলছিলেন ছেলেটা খুব ভাল রে। বড় ঘরের ছেলে কিন্তু কোনও দেমাক নেই।'

বিরাজের মন ভরে গেল একথা শুনে। মনে মনে ভাবল, বাসনাকে ঘিরে ওর মনোবাসনা হয়তো পূর্ণও হতে পারে। গোরাটা চলে গিয়ে ভালই হয়েছে। সবসময় বাসনাকে ওর খুব কাছে পেতে কোনও অসুবিধেই হবে না আর।

বাসনাদের ঘরে এলে ওর মা খুব আদরযত্ন করলেন বিরাজকে। ভাল ঘিয়ের হালুয়া আর পরোটা খেতে দিলেন। তারপর চা।

বিরাজ বলল, 'আপনি জানেন কিনা জানি না। ভূতের ভয়ে আমার বন্ধুটি কালই বিদায় নিয়েছে এখান থেকে। লছমিদিদি একটা মুরগি আনতে গেছে। আপনার বাসনা কিন্তু আজ আমাদের ওখানেই খাবে।'

মা বললেন, 'বেশ তো বাবা, ওর মন যদি চায় তো যাক না। তা ছাড়া আর ক'দিনই বা আমার মেয়ে হয়ে থাকবে ও? বড় হয়েছে। এবার তো কারও না কারও ঘর করতে চলে যাবে। ওর ভাগ্যে যে কোন মহাপুরুষ আছেন তা কে জানে?'

বিরাজ একবার বাসনার মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'ওর ভালই হবে, দেখবেন।'

'তোমার কথাই যেন সত্যি হয় বাবা।'

এরপর ওরা দু-জনে যখন মায়ামাধুরীতে ফিরে এল তখন দেখল লছমিদিদি কাকে যেন নিয়ে এসে মুরগি কেটে ছাড়াতে দিয়েছে।

বাসনাও এবার লছমিদিদির সঙ্গে রান্নার কাজে হাত লাগাল। আর সেই অবসরে বিরাজ সিন্দুকের চাবি নিয়ে দোতলার একটি ঘরে গিয়ে ব্যাঙ্কের কাগজপত্তর ইত্যাদি দেখতে লাগল। গয়নার বাক্স খুলে গয়নাও পেল অনেকগুলো। চুড়ি, বালা, হার— বেশ কয়েক ভরির।

বিরাজ যখন এইসব নিয়ে ব্যস্ত, ঠিক তখনই একটা ট্রে-তে করে চা বিস্কুট নিয়ে ওপরে এল বাসনা। দেখেই বলল, 'ও বাবা। এতসব কোথায় ছিল? কার এগুলো?'

'আমার দিদার।' তারপর একটু হেসে বলল, 'তুমি রাজি থাকলে তোমারও হতে পারে।' বাসনা লজ্জায় রাঙা মুখে 'ধ্যাৎ' বলে উধাও হয়ে গেল।

ওর লজ্জা দেখেই বিরাজের মনে হল বাসনা ওর দিক থেকে ডাক পেলে না করবে না।

অনেক পরে বিরাজ গঙ্গায় গেল স্নান করতে। ফিরে এসে পেট ভরে মাংস-ভাত খেল। কী সুন্দর রান্না। দারুণ তৃপ্তি হল খেয়ে।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাসনা চলে গেল ওদের বাড়িতে।

বিরাজের দিবানিদ্রা হয় না। তাই শুয়ে শুয়ে শুধুই এপাশ-ওপাশ করতে লাগল।

বিকেল হতেই বাসনা আবার এল। বলল, 'চলুন আপনাকে আমাদের এখানকার কেল্লা দেখিয়ে আনি।'

সামনেই কেল্লা। স্পষ্ট দেখা যায়।

বিরাজ বলল, 'চলো তবে।'

ওরা নীচে এলে লছমিদিদি ওদের চা করে খাওয়াল।

বাসনা বেশ সাজগোজ করেই এসেছিল। বিরাজও পোশাক পরিবর্তন করে অনেক আনন্দ নিয়ে চলল কেল্লা দেখতে। শুধু কেল্লা দেখা নয়, সন্ধ্যায় গঙ্গার তীরে বসে সূর্যাস্তও দেখল দু-জনে।

অনেক পরে ওরা আবার ফিরে এল মায়ামাধুরীতে।

বাসনা আর ভেতরে ঢুকল না, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'শুনুন, আর কিন্তু একদম বাইরে বেরোবেন না। লছমিদিদি চলে গেলে দরজায় খিল দিয়ে ওপরের ঘরেই থাকবেন। দিদিকে বলবেন খাবারটা আপনার ঘরেই দিয়ে আসতে। আর একটা কথা, কেউ হাজার ডাকাডাকি করলেও বাইরে বেরোবেন না। সাড়া দেবেন না। এমনকী আমি এলেও না।'

বাসনার কথা শুনে এবার ওর গা ছমছম করে উঠল।

বাসনা আবার বলল, 'আজকের রাত্রিটা দেখুন। তেমন বুঝলে কাল থেকে আমাদের ঘরেই আপনার থাকার ব্যবস্থা করে দেব। বাবা কয়েকদিনের জন্য দেওঘরে গেছেন, আমাদের ঘরও ফাঁকা।'

বাসনা চলে গেলে লছমিদিদি বিরাজের রাতের খাবার গোটা চারেক রুটি আর সকালের মাংস ওপরের ঘরে রেখে এল। আগের দিনের মিষ্টি তো ছিলই ঘরে। বাসনার কথামতো লছমিদিদিকে বিদায় দিয়ে উঠোনের দরজায় খিল এঁটে দোতলায় শোবার ঘরে চলে এল বিরাজ।

হ্যারিকেনের আলোয় অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়ে একসময় খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে শুয়ে পড়ল বিরাজ। বাসনার সঙ্গে আজকের বিকেল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাটিয়ে দারুণ আনন্দ পেয়েছে ও। তাই ওর কথা ভাবতে ভাবতেই এক আশ্চর্য মধুরিমায় ভরে উঠল মন-প্রাণ।

রাত তখন কত তা কে জানে? হঠাৎই মেয়ে গলার এক সুললিত কণ্ঠের গানের সুরে ঘুমটা ভেঙে গেল বিরাজের। গানের সুর তো ভেসে আসছে বাগানের দিক থেকে। এত রাতে বাগানে এসে গান গায় কে?

বিরাজ আর থাকতে পারল না। পা টিপে টিপে বারান্দায় এসে বাগানের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল এক পরমাসুন্দরী কন্যা তার রূপের ছটায় বাগান আলো করে নানা ফুলে গাঁথা মালা নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে এদিক-সেদিক ঘুরছে। কোনও মেয়ের এত রূপ বিরাজ এর আগে আর কখনও দেখেনি। ওর মনে হল, এখনই বাগানে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়ায়। আরও কাছ থেকে গান শোনে। বাগান তো ওদেরই। তাই ওখানে যাওয়ার অধিকারও ওর আছে।

ও যখন বাগানে যাওয়ার কথা চিন্তা করছে তখনই একটি খিলখিল হাসির শব্দে পিছু ফিরে তাকাল। দেখল নীচে নামার সিঁড়ির কাছে আর এক রূপবতী মোহিনী মূর্তিতে ওর দিকে তাকিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

বিরাজ বলল, 'কে তুমি!'

মোহিনী বলল, 'আমি সেই।'

'বাগানে গান গাইছে কে?'

'কেউ তো না। কেউ নেই ওখানে।'

বিরাজ বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখল সত্যিই সেখানে কারও কোনও অস্তিত্ব নেই। আবার পিছু ফিরে দেখল মোহিনীও উধাও। চোখের পলকে গেল কোথায় মোহিনী!

বাগানের ভেতর থেকে মোহিনীর সুরেলা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আমি এ-খা-নে।'

বিরাজ বাগানে দৃষ্টি দিতেই দেখতে পেল মোহিনীকে। একটি শ্বেত রঙ্গনের ডাল ধরে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকা মোহিনী হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে। ও

ক্ষণবিলম্বও না করে তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীচে। কিন্তু কোথায় মোহিনী? কেউ তো নেই।

এবার ও নিজের ভুল বুঝতে পারল। বাসনা ওকে বারবার বলেছিল কারও ডাকে সাড়া না দিতে। কিন্তু সেই ভুলই সে করে বসল। ওর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তখন। জীবনে এই প্রথম ওর প্রেতাত্মা দর্শন। তাই আর বাগানে না থেকে ঘরের দিকেই পা বাড়াল।

হঠাৎই সুললিত কণ্ঠের এক মধুর স্তোত্রপাঠ কানে আসতে থমকে দাঁড়াল বিরাজ। নানাবিধ সুগন্ধি ফুলের সুবাসে চারদিক তখন ম-ম করছে। ও দেখল এক দিবপুরুষ হাসিহাসি মুখ করে এগিয়ে আসছেন ওর দিকে। তাঁর গলায় পরমাসুন্দরীর হাতের সেই পুষ্পমাল্য। জ্যোতিষ্মান দিব্যপুরুষ কাছে এলে বিরাজ তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনি কে? এই বাগানে কেন?'

দিব্যপুরুষ বললেন, 'আমার এবং ওই দুই যুবতীর আশ্রয়স্থল এখানেই। এই বাগানের সর্বত্র আমরা সূক্ষ্মশরীরে ঘুরে বেড়াই। যারা আমাদের অস্তিত্বকে মর্যাদা দেয় আমরা তাদের দেখা দিই না। তোমার দাদু-দিদা আমাদের অস্তিত্বের কথা জানতেন। ওঁরা অত্যন্ত শুদ্ধাচারী ছিলেন। সন্ধ্যা সমাগমে তোমার দাদু এখানেই ঘাসের ওপর বসে গীতাপাঠ করতেন। দিদা গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিয়ে ধূপধুনো দিতেন। ওঁরা নেই। অনাচারী কাউকে আমরা সহ্য করতে পারি না। তাই মাঝে মাঝে আমাদের অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটিয়ে তাদের ভয় দেখাই। কারণও আছে। অযথা কারও প্রাণহানি হোক এটা আমরা চাই না। এই বাড়ির পরমায়ু বেশিদিন নয়। সে কথা জানানোর জন্যই তোমাকেও দেখা দিলাম। এখন থেকে এ বাড়ির মায়া ত্যাগ করো। যত শীঘ্র সম্ভব এখান থেকে চলে যাও।'

কথা শেষ হতেই দিব্যমূর্তিও মিলিয়ে গেলেন।

বিরাজ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। আঁধারের আবছা ভাব কেটে গিয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠছে তখন।

এরপর ঘরে এসে চোখেমুখে একটু জল দিয়ে বাসনাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল বিরাজ।

এত ভোরে ওকে এইভাবে আসতে দেখে বাসনা ও মা দু-জনেই এগিয়ে এল ওর দিকে।

বাসনা বলল, 'কী হল আপনার? এত ভোরে আমি না ঘর থেকে বেরোতে বারণ করেছিলাম। নিশ্চয়ই কোনও ভয়ের ব্যাপার হয়েছে?'

বিরাজ বলল, 'তেমন কিছু নয়। আগে আমাকে এক কাপ চা খাওয়াও তো দেখি।'

সঙ্গে সঙ্গে চায়ের ব্যবস্থা হল।

চা খেতে খেতেই বিরাজ রাতের ঘটনার কথা প্রকাশ করল ওদের কাছে। তারপর বাসনার মাকে বলল, 'আজ আর লছমিদিদির রান্না নয়, এ বাড়িতেই দুপুরের অতিথি হব আমি। আপনার হাতের রান্নাই খাব আমি আজ।'

বাসনার মা বলল, 'এ তো খুবই আনন্দের কথা বাবা।'

বিরাজ এবার অসংকোচ বলল, 'একটু বেলায় এখানকার পোস্ট অফিসে গিয়ে বাড়িতে একটা তার করে দিয়ে আসব। আপনাদের অমত না থাকলে আমার মা-বাবা দু'জনেই এসে আশীর্বাদ করে যাবেন বাসনাকে।'

আনন্দে অভিভূত বাসনার মা আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছলেন।

বাসনাও প্রথমে ওর মাকে পরে গলায় আঁচল দিয়ে বিরাজকে প্রণাম করল।

নৌরঙ্গীর মোহিনী

বীরভূম জেলার প্রান্তরেখা ছুঁয়ে এক নিভৃত নির্জনে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী ময়ূরাক্ষী। নদীর এপারে ভাণ্ডীরবন। ওপারে নৌরঙ্গী। এ গ্রামের বিগ্রহ হলেন রাধামাধব। মাত্র পঁচিশঘর বাসিন্দা নিয়ে মুঠোর মধ্যে ধরা যায় এমন একটি গ্রাম। এর উত্তর-দক্ষিণ-পূর্বে কোথাও কোনও গ্রামের চিহ্ন নেই। তবে পশ্চিম সীমান্তে তাও এক কিমি দূরে বৈদ্যনাথপুর নামে একটি গ্রাম আছে। স্থানটি সিউড়ি শহর থেকে বেশ কিছু দূরে বর্ডার চেকপোস্ট পার হয়েও পাঁচ কিমি যেতে হয়।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এই গ্রামে আমার যাতায়াত ছিল খুব। এখন বলতে গেলে আর একদমই যাওয়া হয় না। গ্রামটি নদী থেকে অনেক দূরে এবং একটু উচ্চস্থানে। মধ্যে একটি কাঁদর পার হতে হয়। কাঁদর হল খালের মতো এঁকে-বেঁকে বয়ে চলা ছোট্ট একটি নদী। গ্রীষ্মে হাঁটুজল, বর্ষায় প্রবল প্রবাহ। আমি ওই গ্রামে গেলে খুব ভোরে উঠে রাঙামাটির পথ ও ঢেউ খেলানো বন্ধুর উপত্যকায় আপন মনেই ঘুরে বেড়াতাম। তার কারণ এই জায়গাটি ছিল আমার কাছে প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য। কেননা এখানকার পরিবেশ ছিল সর্বত্র বনময়। এদিক সেদিকে বেশ কয়েকটি ছোট-বড় টিলা। আর দূরে বহুদূরে মাসাঞ্জোর, দুমকা ও সাহেবগঞ্জ অঞ্চলের মেঘান্ধকার পাহাড়ের রেখা। আমার বয়স তখন বছর পঁচিশ। খুব ভোরে উঠে দূরে পাহাড়গুলোর দিকে নজর রেখে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎই একটা মালভূমির মতো অংশের খাল বেয়ে নীচে নামতেই এক অপার্থিব কণ্ঠের সুললিত স্বর কানে এল।

থমকে দাঁড়ালাম। পুরুষ কণ্ঠে কেউ যেন বলে চলেছে, 'এই বিশ্বচরাচরই তোমার রচনা। কিন্তু তুমি বিরাজ করো মহাশূন্যে ব্রহ্মে লীন হয়ে। ব্রহ্ম কী তা আমি জানি না। কেননা ব্রহ্মজ্ঞান সকলের হয় না। তোমার স্বরূপও আমি দেখিনি কখনও। শুনেছি কোনও কোনও ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়। আমি আমার ভালমন্দ সব কিছু তোমারই চরণে নিবেদন করেছি। সন্ধ্যাগায়ত্রী কোনও কিছুই আমি জানি না। আমি শুধু তোমাকে জানি। হে দেব! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।'

সেই সুললিত কণ্ঠস্বর শুনে অভিভূত হয়ে গেলাম। একটু এগিয়ে যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না আমার। দেখলাম এক দিব্যকান্তি সুদর্শন যুবক কাঁদরের ধারে একটু উচ্চস্থানে প্রকাণ্ড একটা বেলগাছের নীচে উপলাকীর্ণ অংশে পদ্মাসনে বসে মুদিত নয়নে প্রার্থনা করছেন। তাঁকে দেখে আমার মনে হল ইনি যেন সেই গৌতম বুদ্ধের অবতার। বয়স প্রায় আমারই মতো। পরনে সাদা পোশাক। সাদা উত্তরীয়। কপালে একটি শ্বেতচন্দনের টিপ্পা। কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার একটি কারণ তিনি যেখানে বসে আছেন সেখানে তাঁকে ঘিরে শোভাবর্ধন করছে এক নয়নমনোহর জ্যোতির্বলয়।

পাছে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয়, সেই ভয়ে আর এক পা-ও এগোতে পারলাম না আমি। একটু পিছিয়ে দেখলাম সেখানে একটু উচ্চস্থানে বহুদিনের পুরনো জীর্ণদশাপ্রাপ্ত একটি মন্দির। এর আগে আমি এদিকে কখনও আসিনি। তাই এখানে কোনও মন্দির আছে বলেও জানা ছিল না। তবু আমি পায়ে পায়ে সেখানে গিয়ে মন্দিরে ঢুকে এক যুগলমূর্তি দর্শন করলাম। শ্বেতপাথরের আলিঙ্গনাবদ্ধ রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। দেখে আমার সমস্ত মন প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

মন্দির এলাকাটি একেবারে ঝক্‌ঝক্ করছে। ধোওয়া মোছা নিকানো মুছানো চারদিক। সেই সাধক তখন সুললিত কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ করছেন। তা শুনে আমার মধ্যে কেমন যেন একটা শিহরণ বহে গেল। তখন পুবের আকাশ লাল করে সূর্যদেব উদয় হচ্ছেন। আমি কারও তপোভঙ্গের অভিশাপ নেব না বলে ধীরে ধীরে গ্রামের দিকে এগিয়ে চললাম।

বেশ কিছুটা পথ এসেছি অমনি বিস্ময়ের সৃষ্টি করে কোথা থেকে যেন এক ষোড়শী এসে হাজির হল আমার সামনে। সারা শরীরে যেন বিদ্যুতের

প্রভা। মুখের দিকে তাকালে মুনিরও মতিভ্রম হয়। যেমনই তার অঙ্গসৌষ্ঠব, তেমনই চোখমুখের গড়ন। নির্বাক আমি সে মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা ফেলতেও ভুলে গেলাম। তার হাতে ছিল কাঁচা শালপাতার ঠোঙায় ভরা বেশ কয়েকটা শুভ্র গন্ধরাজ ফুল। মেয়েটি কেমন যেন স্বপ্নালু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি না মন্দিরে গিয়েছিলে? আমি দূর থেকে দেখেছি তোমাকে।' বলে ফুলগুলো আমার দিকে এগিয়ে বলল, 'সব ফুল তুমি নাও।'

এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। 'সব ফুল আমি নেব?'

'নাও না, ঠাকুরকে দেবে।' বলে ফুলগুলো আমার হাতে দিয়ে দ্রুত মন্দিরের দিকে পা চালাল।

আমি অনেকক্ষণ তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ব্যাপারটা আমার কাছে স্বপ্নময় মনে হল। এমন এক সুন্দরী-ললনা এইভাবে নিজের থেকে এসে আমাকে ফুল উপহার দেবে এ আমার ধারণারও অতীত। বলতে গেলে আমার জীবনে এই প্রথম কোনও মেয়ের কাছ থেকে ফুল পাওয়া। তার থেকেও চমকপ্রদ ব্যাপার যেটা সেটা হল এই শাল পলাশের দেশে মহুয়াবনে এত গন্ধরাজ ফুল ও পেল কোথা থেকে? এই গ্রামের ধারে কাছে তো কোথাও আমি গন্ধরাজের একটি গাছও দেখিনি, তাহলে?

যাই হোক, মেয়েটির মুখস্মৃতি বুকে নিয়ে গ্রামে এলাম। নির্জন পথ ধরে চলে এলাম রাধামাধবের মন্দিরে। একজন সেবায়েৎ তখন বিগ্রহের অঙ্গসজ্জা করছিলেন। তাঁর হাতে ফুলগুলো তুলে দিতেই বিস্ময় প্রকাশ করলেন তিনি। বললেন, 'এ তো গন্ধরাজ! এ ফুল তুমি কোথায় পেলে?'

আমি সত্য গোপন করে বললাম, 'আমি ওই ওদিকের বনে গিয়েছিলাম। ফেরার সময় কোথা থেকে যেন একটি মেয়ে এসে ফুলগুলো দিয়ে গেল আমার হাতে। আমি তাকে চিনি না, দেখিওনি কখনও।'

'যাক, যোগ্য লোকের হাত দিয়েই এসেছে ফুলগুলো। রাধারানিই তাঁর পছন্দের ফুল আনিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না এই গ্রামের ধারে কাছে তো কোথাও কোনও গন্ধরাজের গাছ নেই। তাহলে কে দিল এই ফুল। তবে কি বৈদ্যনাথপুরের কেউ? কে জানে?'

আমারও জানার দরকার নেই। যে বাড়িতে এসেছি সে বাড়িতেই জলযোগ পর্ব সেরে কথায় গল্পে কাটালাম। পরে এ বাড়ি সে বাড়ি করেও চা খেলাম দু'তিন কাপ। একটু বেলায় গ্রামেরই দু'একজনের সঙ্গে কাঁদর পার হয়ে ময়ূরাক্ষীতে গেলাম স্নান করতে। এরপর দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে বিশ্রাম। সারাদিনে সবকিছুই করলাম। কিন্তু মন পড়ে রইল সেই মেয়েটির দিকে। কাদের মেয়ে, কোথায় থাকে, ওই নির্জনে সে কখন এল, কীভাবে এল, এই সবই চিন্তা করতে লাগলাম। মেয়েটি কি ওই দিব্যজ্যোতি সম্পন্ন যুবকেরই কেউ? না হলে এমন অঙ্গভরা রূপ ও পেল কোথা থেকে?

যাইহোক, বিকেলের দিকে আমি কাউকে কিছু না জানিয়ে পায়ে পায়ে আবার এগোলাম সেই রম্যভূমির দিকে। মনে সুপ্ত বাসনা এই, যদি আর একবার সেই মেয়েটির সঙ্গে আমার দেখা হয়। দেখা হলে ওর পরিচয় জানব। আমার প্রেম নিবেদন করব। তারপর ওর বা ওর বাড়ির লোকেদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমার জীবনসঙ্গিনীরূপে ওকেই বেছে নেব আমি। কেননা প্রথম দর্শনেই ওর প্রতি আমার গভীর অনুরাগ ও ভালবাসা জন্মেছে। যা এর আগে আর কোনও মেয়েকে দেখে কখনও হয়নি।

অনেকটা পথ পরিক্রমার পর যখন আবার আমি সেই জায়গায় এলাম তখন কেমন যেন একটা গা-ছমছমানি ভাব এল আমার মধ্যে। উঃ সে কী দারুণ নির্জনতা। কেউ কোথাও নেই সেখানে। সেই সাধকের সাধনভূমি বেলতলায় আসতেই নানাবিধ ফুলের গন্ধে ভরে উঠল বুকের ভেতরটা। তবুও আমি মন্দিরের দিকে এগোলাম। কিন্তু আশ্চর্য! বনের মধ্যে সেই মন্দিরটিকে কিছুতে আবিষ্কার করতে পারলাম না।

এমন সময় হঠাৎ নজর পড়ল সেই মেয়েটির দিকে। সে তখন অনেকদূরে একেবারে নদীর কাছাকাছি। ওকে দেখে আর আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। কী করেই বা স্থির থাকব? ওরই কারণে আমি যে অস্থির। আমার মনের কথা বলার জন্য ওই নদীতীর ছাড়া উপযুক্ত স্থান আর কোথাও নেই। দৈবের যোগাযোগ যে এভাবে হতে পারে তা আমি ভাবতেও পারিনি। যাইহোক, ঢাল থেকে নেমে পায়ের পাতা ভিজিয়ে কাঁদর হয়ে দ্রুত ওর দিকে এগোতে লাগলাম। হঠাৎই ও আমার চোখের আড়াল হয়ে গেল। গেল

কোথায়? কোথায় গেল সে? নিশ্চয়ই ভাঙন বেয়ে নদীতে নেমেছে। তার মানে দেখা হবেই। আজই ওর মন আমি জয় করব।

এক সময় নদীর খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছলাম। এখানে উন্মুক্ত প্রান্তরে ছোট্ট একটি পদ্মদিঘি আছে। মেয়েটি বোধহয় ফুল তুলেছে। তারই নমুনা চারদিকে। কিছু ফুলের পাপড়ি মৃণাল ইত্যাদি পড়ে আছে একদিকে।

আমি একবার থমকে দাঁড়ালেও আবার হনহন করে পা চালিয়ে চলে এলাম নদীর পাড়ে উঁচু ডাঙালে। কিন্তু কই? যার জন্য এত কষ্ট করে এই অবেলায় এখানে আসা তার তো দেখা নেই। ঠিক যেন ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেছে মেয়েটা।

আমি বিষণ্ণ বদনে নদীর ভাঙন ডাঙার উঁচু জায়গাটিতে বিরহকাতর মন নিয়ে বসে রইলাম চুপচাপ। মনে মনে কত কথাই না ভাবতে লাগলাম। তবে কি আমার দেখার ব্যাপারে কোনও ভুল হয়েছিল? কিন্তু এমন তো হবার কথা নয়।

হঠাৎই কোথা থেকে যেন একটি পদ্মকুঁড়ি হাওয়ায় ভেসে আমার কোলে এসে পড়ল। আমি অবাক হয়ে বিস্ময়ে এদিক সেদিক তাকাতে লাগলাম। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না। এমন সময় ঠিক আমার পিছন দিক থেকে কে যেন বলে উঠল, 'আমি এখানে।' আমি ঘুরে তাকিয়েই দেখলাম আমার সেই মোহিনী আমার দিক থেকে একটু তফাতে মধুর হাসিতে মুখ ভরিয়ে ছলনাময়ীর মতো দাঁড়িয়ে আছে।

ওকে দেখে যে কী আনন্দ হল আমার তা আমিই জানি। বললাম, 'তুমি কি জাদু জানো? দূর থেকে তোমাকে দেখেই এদিকে এলাম। এসে দেখি তুমি নেই। এই নির্জনে কোথায় লুকিয়েছিলেন তুমি?'

'আমি তো এখানেই ছিলাম। তা দূর থেকে আমায় দেখে এই গোধূলিবেলায় এমন নির্জনে এখানে আসার সত্যিই কি কোনও প্রয়োজন ছিল?

'হ্যাঁ ছিল।'

ও হেসে বলল, 'আমি কি সোনার হরিণ?'

আমি আবেগতাড়িত হয়ে বললাম, 'মায়ামৃগ তুমি। তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে। তাই তো এমন ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলাম এখানে।'

ও বলল, 'তা হলে আর একদিন বোলো। আমার আরাধ্য দেবতার আসার সময় হয়েছে। আমি যাই।'

ওর কথা শুনে বুক কেঁপে উঠল আমার। তবু বললাম, 'যাই বলতে নেই, বলো আসি।'

ও বলল, 'আচ্ছা আসি।' বলেই বিদায় নিল।

খানিক যাওয়ার পরই আমি ওকে পিছু ডাকলাম, 'এই শোনো।'

ও বলল, 'আবার কী হল?'

'তোমার নামটা জানা হল না তো?'

'নাম জেনে কী করবে বলো? আমার নাম স্বপ্না। তবে একটা কথা, ভুলেও যেন আবেগতাড়িত হয়ে আমায় নিয়ে মনে কোনও স্বপ্ন রচনা কোরো না। তা হলে কিন্তু দুঃখ পাবে।' বলেই উধাও হয়ে গেল।

আমিও পায়ে পায়ে আবার সেই দূর পথ অতিক্রম করে কাঁদর পেরিয়ে গ্রামে এলাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। রাধামাধবের মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজছে। আমার মনের ভেতরে তখন প্রেমযমুনা উত্তাল। শুধু ভেবে পেলাম না ওই সুন্দরী স্বপ্না আমাকে অমন মর্মান্তিক কথাটা বলে গেল কেন?

সে রাতটা কীভাবে যে কাটালাম তা আমিই জানি। পরদিন আবার সেই অন্ধকার থাকতে আমি বনপথ ধরে এগিয়ে চললাম তার দেখা পাবো বলে। আমার মধ্যে তখন আর আমি নেই। কাল সারারাত স্বপ্নাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছি আমি। আজ যদি ওর দেখা পাই তাহলে যেভাবেই হোক জয় করবই ওকে। ব্রাহ্মমুহূর্তে যথাস্থানেই এসে পৌঁছলাম আমি। কাছাকাছি আসতেই শুনতে পেলাম সেই দিব্যপুরুষের সুললিত কণ্ঠের স্তোত্রপাঠ। প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল। পূর্ণ যৌবনের এক দিব্য প্রতিমূর্তি। কী সুন্দর। আজও সেই তাঁকে ঘিরে এক আশ্চর্য জ্যোতির্বলয়। আমি তাঁর খুব কাছাকাছি যেতেই তিনি ইশারায় হাত নেড়ে আমাকে চলে যেতে বললেন। আমি সে আদেশ অমান্য করতে পারলাম না। একটু একটু করে পিছিয়ে আবার সেই মন্দিরের কাছে এলাম। কিন্তু এখানে তো কেউ নেই। আমার আদরের স্বপ্নাসুন্দরী কি আসেনি আজ? নাকি আজও সে ছলনাময়ী? আমি মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন

করলাম। স্বপ্নাকে খুঁজলাম। কিন্তু কোথায় সে? একবার ভাবলাম তার নাম ধরে ডাকি। আবার ভাবলাম না থাক। ওকে ডাকলে যদি সাধকের সাধনায় কোনও বিঘ্ন ঘটে তাই কিছুক্ষণ এদিক সেদিক করে যখন ফিরে আসছি তখনই সেই গতদিনের মতো কাঁচা শালপাতায় মুড়ে একরাশ শিউলি ফুল নিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এল সে, 'ফুল নেবে না, ফুল? কত ফুল নিয়ে এসেছি তোমার জন্য। সব ফুল তোমারই। নিয়ে যাও।'

আমি দু'হাত পেতে ফুল নিলাম। বললাম, 'তোমাকে যে আমার কিছু বলার ছিল।'

স্বপ্না বলল, 'এখন সময় নয়।'

'এখনই সময়। আকাশ এখনও পরিষ্কার হয়নি। সবে একটি-দুটি করে পাখি জেগে উঠে কলরব করছে। ধারে কাছে কেউ কোথাও নেই। এর চেয়ে উপযুক্ত সময় আর কখন-ই বা হতে পারে?' স্বপ্না সে কথার উত্তর না দিয়ে কেমন যেন রহস্যময়ীর মতো আমার চোখে চোখ রেখে আস্তে করে বলল, 'সন্ধের সময় এসো।' তারপর বলল, 'নিজের অজান্তে কোনও ভুল করে বসোনি তো? তাহলে কিন্তু দুঃখ পাবে।'

উত্তরে আমি বললাম, 'ভুল কিনা জানি না, তবে আমি তোমাকে চাই।'

স্বপ্না দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'না।' বলেই আর কোনওদিকে না তাকিয়ে দ্রুত স্থানত্যাগ করল।

হাহাকার করে উঠল আমার বুকের ভেতরটা। স্বপ্না আমাকে ওর ছলাকলায় মাতিয়ে দিয়ে এভাবে এড়িয়ে গেল কেন? তবে কি ও অন্য কারও? ওই দিব্যপুরুষ তাহলে কে? ওরা দু'জন ছাড়া এখানে আর কেউ নেই কেন? এইসব চিন্তা করতে করতে আবার আমি গ্রামে ফিরলাম। রাধামাধবের মন্দিরে গিয়ে ফুলগুলো পূজারির হাতে দিলাম।

ফুল পেয়ে বিস্ময়ের অন্ত রইল না পূজারিজির। বললেন, 'এ ফুল তুমি কোথায় পেলে? এখন তো শিউলি ফুলের সময় নয়।'

বললাম 'কাল যে মেয়েটি আমাকে গন্ধরাজ দিয়েছিল আজও সে-ই দিয়েছে।'

পূজারিজি গম্ভীর মুখে বললেন, 'সবই রাধারানির কৃপা।'

যাইহোক, আমার তখন অন্য ভাব। তাই বুকের ভেতর তোলপাড় করলেও অশান্ত মন নিয়ে সারাটা দিন কাটিয়ে ঠিক সন্ধের মুখে আবার সেই দেবভূমে গেলাম। কিন্তু আশ্চর্য। পুরনো সেই ভাঙা মন্দিরের কোনও অস্তিত্বই আমি খুঁজে পেলাম না। মন্দির তো নেই। স্বপ্নাও নেই। বেলতলায় দিব্যপুরুষের সেই আসনও তখন শূন্য।

আমি যখন বিস্ময়ের ঘোরে এদিক সেদিক করছি তখনই স্বপ্নার গলা শুনতে পেলাম, 'আমি এখানে।'

তাকিয়ে দেখলাম কাঁদরের ধারে বড় একটি পাথরের ওপর কাঁখে কলসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্বপ্না।

আমি দ্রুত তার কাছে গিয়ে বললাম, 'তুমি এখানে। আমি তোমাকে মন্দিরে কত খুঁজছি। কিন্তু মন্দিরটাই বা গেল কোথায়? তবে কি আমি পথ ভুল করেছি?'

স্বপ্না হেসে বলল, 'না। জীবনের মস্ত একটা ভুল করে ফেলেছ। তোমার দু'চোখে এখন আমার স্বপ্ন। কাজেই মন্দির দেখতে পাবে কী করে?'

'কিন্তু একা তুমি এখানে কী করছ?'

'উনি আসবেন তাই দু'কলসি জল ঢেলে ধুয়ে দিয়ে এলাম জায়গাটাকে।' বলে কলসিটা নামিয়ে রাখল একপাশে। তারপর বলল, 'ওই দেখো, উনি আসছেন। ওই-ওই-ওই।'

চেয়ে দেখলাম সেই অনিন্দ্যসুন্দর সাধক বিল্ববৃক্ষমূলে একটু একটু করে প্রকট হয়ে সাধনায় বসলেন।

স্বপ্না এখান থেকেই তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করল।

ওর দেখাদেখি আমিও প্রণাম করলাম। স্বপ্নাকে বললাম, 'আশ্চর্য! উনি ওইভাবে ছায়াছবির মতো বেলতলায় আবির্ভূত হলেন কীভাবে?'

'ওঁর যে ছায়াশরীর। উনি কখনও প্রকট হন কখনও নিরাকার হয়ে থাকেন।'

'উনি কে?'

'আমার আরাধ্য দেবতা। আমার প্রিয়তম। রানিবহালের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে আমি। ওঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে ওঁকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু ওই ব্রাহ্মণ সন্তান অসবর্ণতার কারণে আমাকে ভালবাসলেও গ্রহণ করতে রাজি

হননি। তাই মনের দুঃখে আমি দেহঘাতী হলাম। কিছুদিন পরে সর্পাঘাতে ওঁরও দেহান্ত হল। এখন আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা নয়, গুরুশিষ্যার মতো এই নির্জনে অবস্থান করি। অদূরে নৌরঙ্গী গ্রাম। সে গ্রামে রাধামাধব আছেন। তাই ওখানে আমাদের স্থান নেই। উনি নিষ্কাম। আমার কামনা বাসনা কিছুই মেটেনি। আমারও ছায়াশরীর। তোমাকে দেখার পর আমার মনে হল দেহঘাতী হয়ে আমি খুবই ভুল করেছি। যাকে আমার মন প্রাণ সবকিছু উজাড় করে দিলাম দেহান্তের পরেও সে তা গ্রহণ তো করলই না উপরন্তু রইল নির্বিকার। অথচ তোমার চোখ দেখেই বুঝেছি আমার জন্য তুমি কত ব্যাকুল। কিন্তু এখন তোমার বুকে নিজেকে সমর্পণ করার কোনও উপায় নেই আমার। সেজন্যই বলছিলাম আমায় ঘিরে কোনও স্বপ্ন যেন মনের মধ্যে রচনা কোরো না। তোমাকে স্বরূপে দেখা দেওয়াই আমরা ভুল হয়েছে। শুধু রাধামাধবের চরণে পুষ্পার্ঘ দেবার জন্যই ছায়াশরীরে তোমার কাছে গিয়েছিলাম। আমাকে মনে রেখো না বন্ধু। আমি যাই। আরতির সময় হয়েছে। তবে আজই কিন্তু আমাদের শেষ দেখা। আর আমাকে দেখতে পাবে না।'

কথা বলতে বলতেই আমার চোখের সামনে বিলীন হয়ে গেল স্বপ্না। সেই দিব্যপুরুষও অস্তিত্বহীন হলেন একসময়। একটু পরেই আরতির ঘণ্টাধ্বনি আমার কানে এল। আমি প্রেত-আতঙ্ক ও বিরহবেদনা দুইই বুকে নিয়ে কাঁদর থেকে উঁচু ডাঙালে এলাম। এখানে কোথাও কোনও মন্দিরই নেই। তবে নানারকম সুগন্ধি ফুলের সুবাস আছে। আর আছে চারদিকব্যাপী ঘোর অন্ধকার।

চন্দ্রনাথ ও দিব্যপুরুষ

প্রায় একশো বছর আগের কথা। হুগলি জেলার জাহানাবাদ, চাঁপাডাঙা ইত্যাদি অঞ্চল সেকালে ছিল যেমনই অরণ্যময়, তেমনই ছিল ওসব দেশে ভয়ংকর সব ডাকাতের উপদ্রব। সে যুগের পরিস্থিতির কথা এখনকার কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।

চাঁপাডাঙায় দামোদর নদের বাঁধের ধারে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে চন্দ্রনাথ। অমন রূপবান যুবক এই অঞ্চলে আর কেউ ছিল না। যে কেউ তার দিকে তাকালে চোখ ফেরাতে পারত না। সে ছিল খুবই নিষ্ঠাবান। গ্রামের মধ্যে যে রাধাবিনোদের মন্দির ছিল সেখানে বলতে গেলে সবসময়ই থাকত সে। খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে বিগ্রহের সেবা-পূজা করত।

ওই মন্দিরে অনেকেই আসত পুজো দিতে। বেশি আসত মেয়েরা। ওই মেয়েদের সঙ্গে আসত পাশের গ্রামেরই চন্দ্রা নামে এক সুন্দরী তনয়া। সে ছিল ওই অঞ্চলের এক বিত্তবান গৃহস্থের কন্যা। ওদের দেখলে মনে হত ওরা দু'জনেই যেন দু'জনের জন্য পৃথিবীতে এসেছে। চন্দ্রনাথের বয়স বাইশ। চন্দ্রাও ষোড়শী। প্রথম দর্শনে দু'জনের প্রতি দু'জনার প্রবল অনুরাগ। তাই রাধাবিনোদের লীলা প্রভাবেই বোধহয় দু'জনেই ভালবেসে ফেলল দু'জনকে। এতদ্‌সত্ত্বেও বিধি বাম। চন্দ্রনাথ তার মা-বাবার সঙ্গে একটি ছোট্ট কুঁড়েঘরে থাকত। খুবই দুঃখ-কষ্টে সংসার চলত ওদের। আর চন্দ্রার বাবা রাজমোহন ছিলেন ওই অঞ্চলের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী। তাঁরাও ব্রাহ্মণ। অতএব দীন-দরিদ্র চন্দ্রনাথের সঙ্গে চন্দ্রার চিরস্থায়ী সম্পর্ক হওয়ার পথে দারুণ বাধা

হয়ে দাঁড়াল। ওদের ভালবাসার কথাটা তো কারও অজানা ছিল না, তাই সেকথা জানতে পেরেই চন্দ্রার ওই মন্দিরে যাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিলেন। শুধু তাই নয়, হরিপালের জমিদার পরিবারের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থাও করে ফেললেন তিনি।

চন্দ্রাহারা চন্দ্রনাথ মণিহারা ফণীর মতো হয়ে উঠল এ কথা শুনে। কিন্তু উপায়ই বা কী? ভাগ্য-ভবিতব্য এসব তো মেনে নিতেই হবে। সে নিজেও জানে তার নিজের অবস্থার কথা। ঘর-সংসার করা দূরে থাক, চন্দ্রাকে প্রতিপালনের ক্ষমতাও তার নেই। অতএব মনে মনে কাঁদতে লাগল সে।

দেখতে দেখতে চন্দ্রার বিয়ের দিন এগিয়ে এল। সে রাত ছিল এক মধুর জ্যোৎস্নায় ভরা রাত। চন্দ্রনাথ সন্ধের পর থেকেই কেমন যেন উদাস হয়ে গেল। মন্দিরের শীতল আরতির পর দ্বার রুদ্ধ করে বিগ্রহের চরণে মাথা রেখে অনেক কাঁদল সে। তারপর সিদ্ধান্ত নিল চন্দ্রা-বিহনে তার পক্ষে বেঁচে থাকাটা সত্যিই অসম্ভব। তাই সে ঠিক করল এ জীবন সে আর রাখবে না। ফুলের মালা গলায় চন্দ্রা বসবে বিয়ের পিঁড়িতে আর সে মালার বদলে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলবে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে। এই ভেবে সে শক্ত মোটা একটা গোরু বাঁধা দড়ি নিয়ে এগিয়ে চলল দামোদরের বাঁধের নির্জনে।

সেখানে গিয়ে সে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল নিজের জন্মভূমির দিকে। তারপর একটি বড় গাছের শক্ত মোটা ডালে দড়ির ফাঁস বেঁধে যেই না সেটা গলায় দিতে যাবে অমনি কে যেন আলো অন্ধকারের ভেতর থেকে বলে উঠল, 'এই। এ তুমি কী করছ?'

চন্দ্রনাথ এদিক সেদিক তাকিয়ে কাউকেই দেখতে না পেয়ে বলল, 'কী আবার করব, আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, 'আত্মাকে হত্যা করা যায় না রে পাগল। তুমি দেহঘাতী হচ্ছ।'

চন্দ্রনাথ বলল, 'হ্যাঁ, তাই। কিন্তু তুমি কে?'

সঙ্গে সঙ্গে বনের একাংশ আলোকিত হয়ে উঠল। আর সেখানে দেখা গেল এক জ্যোতির্ময় বামনকে। তার সর্বাঙ্গে যেন শত সূর্যের ছটা। বামন বলল, 'নামো তুমি গাছ থেকে।'

চন্দ্রনাথ বলল, 'না, আমার সিদ্ধান্ত বদলাবে না।'

'তাহলে আমিই তোমাকে নামাব গাছ থেকে। এ কাজ তোমাকে আমি কিছুতেই করতে দেব না।'

চন্দ্রনাথ হেসে বলল, 'তুমি তো বামন। তুমি কী করে নাগাল পাবে আমার?'

বামন হেসে বলল, 'তুমি আমার এই রূপ দেখেছ, স্বরূপ দেখনি। দেখো এবার।'

চন্দ্রনাথ অবাক বিস্ময়ে দেখল সেই বামন ধীরে ধীরে প্রায় দশ-বারো ফুটের মতো উচ্চ শরীর ধারণ করে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল। সাক্ষাৎ ভগবানের মতো জ্যোতির্ময় পুরুষ সে। মুণ্ডিত মস্তক। মুখে মধুর হাসি। দিব্যপুরুষ বললেন, 'এই কাজ করার আগে নিজের মা-বাবার কথা মনে পড়ল না? তোমার বিহনে তাঁদের বাকি জীবনটা কীভাবে কাটবে একবারও ভেবে দেখলে না তো? সামান্য এক মেয়ের জন্য এ কী করতে যাচ্ছিলে তুমি?'

চন্দ্রনাথ এবার যেন একটু ভয় পেয়েই নেমে পড়ল গাছ থেকে। তারপর সেই দিব্যপুরুষকে প্রণাম করে বলল, 'আমার এই কাজ করতে যাওয়ার কারণ আপনি জানলেন কী করে?'

'আমি সব জানি। বুঝতেই পারছ আমি অশরীরী। আমি নিরাশ্রয় বায়ুভক্ষক। যত্রতত্র ঘুরে বেড়াই। তুমি আমার রাধাবিনোদের পূজারি। আমি কি তোমায় এভাবে মরতে দিতে পারি? তা ছাড়া এ কাজের পরিণাম কী ভয়ংকর তা তুমি জানো না। জন্মান্তরেও পর পর সাত জন্ম এই একই পরিণাম হয়। তবে যদি হয় মুক্তি ।'

চন্দ্রনাথ বলল, 'ওসব আমি জানি না। শুধু বিরহজ্বালা সহ্য করতে পারব না বলেই আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম।'

দিব্যপুরুষ বললেন, 'আবার আত্মহত্যা বলে। আত্মা অবিনশ্বর। তাকে হত্যা করা যায় না। তুমি দেহঘাতী হচ্ছিলে। ভাগ্যে আমি সময়কালে এসে পড়েছিলাম না হলে আমার রাধাবিনোদের ভোগারতিই বন্ধ হয়ে যেত।'

চন্দ্রনাথ বলল, 'আপনার রাধাবিনোদ মানে?'

'অনেক আগে এই বিগ্রহের সেবা তো আমিই করতাম। তখন তুমি জন্মাওনি। তারপরে তোমার বাবা। পরে তুমি।'

'মানলাম। কিন্তু মৃত্যুর পরে আপনার এই অবস্থা হল কী করে?'

'সেটা তো আমি বলতে পারব না। এখন আমি ব্রহ্মের উপাসনা করি। কোনও এক সুন্দরীর মোহে বিগ্রহ সেবায় অমনোযোগী হয়ে ভ্রষ্টাচার করেছিলাম। তারই পরিণামে সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়ে এই দশায় রয়েছি আমি দীর্ঘকাল। কিন্তু তুমি অতি সৎ, সজ্জন ও ধর্মপ্রাণ। চন্দ্রাকে তুমি অত ভালবেসে অত কাছে পেয়ে কখনও তাকে স্পর্শ করা দূরের কথা তার এতটুকু অমর্যাদাও করনি। তাই আমি তোমার পাশে এসে দাঁড়ালাম।'

চন্দ্রনাথ বলল, 'তাতে লাভ কী বলুন? চন্দ্রা ছাড়া আমার জীবন বৃথা। ওকে ছাড়া আমার সবকিছুই বিষময়।'

দিব্যপুরুষ হেসে বললেন, 'আরে পাগল, চন্দ্রা তোমার স্ত্রী। তোমার জীবনকে সুখে শান্তিতে ভরিয়ে মধুময় করে তুলবে।'

চন্দ্রনাথ এবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, বলল, 'আপনি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?'

'না। চন্দ্রাই তোমার উপযুক্ত পাত্রী। ওর সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে। তবে আজ রাতে নয়। কিছুদিন পরে।'

'কিন্তু কীভাবে? আজকের রাতই ওর বিয়ের রাত। এতক্ষণে বিয়ে হয়তো হয়েই গেছে।'

'না। হয়নি, হবেও না। তবে তোমার সঙ্গে ওর বিয়েটা কবে কীভাবে হবে সে চিন্তাটা আমার। এখন আমি যা বলি তা মন দিয়ে শোনো। চন্দ্রাকে পেতে হলে একটা কাজ কিন্তু করতে হবে তোমাকে। সেই কাজটা ভালভাবে করতে পারলে চন্দ্রাকে তুমি তো পাবেই উপরন্তু ভাগ্যের চাকাও ঘুরে যাবে তোমার।'

চন্দ্রনাথ উল্লসিত হয়ে বলল, 'কী কাজ করতে হবে বলুন, তা যত কঠিন কাজই হোক না কেন আমি করবই। চন্দ্রাকে পাবার জন্য আমি সবকিছু করতে পারি।'

দিব্যপুরুষ বললেন, 'কোনও কঠিন কাজ নয়। তুমি একবার তোমার বাঁদিকে গাছতলার দিকে তাকিয়ে দেখো।'

চন্দ্রনাথ গাছতলার দিকে তাকিয়ে দেখল ছায়া-ছায়া কালো-কালো জনা সাতেক প্রেত করুণ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।'

চন্দ্রনাথ বলল, 'ওরা কারা?'

'বুঝতে পারছ না?'

'হ্যাঁ পারছি।'

'ওই অতৃপ্ত আত্মাদের মুক্তি কামনায় তোমাকে গয়ায় যেতে হবে। সেখানে গিয়ে ওদের নামে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান করতে হবে। তাহলেই ওরা প্রেতযোনি থেকে মুক্ত হবে। মুক্ত হয়েই প্রচুর ধনরাশি উপহার দেবে তোমাকে।'

চন্দ্রনাথ বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'ওরা অত ধনরত্ন পাবে কোথা থেকে?'

'সেকথা জানার অধিকার তোমার নেই। তবু বলি, বিভিন্ন সময়ে ডাকাতরা ডাকাতি করে যা সঞ্চয় করেছে তা বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে রেখেছে। সেই সবেরই সন্ধান ওরা তোমাকে দেবে। তাতেই ভাগ্য ফিরে যাবে তোমার। চন্দ্রার বাবা-মা নিজেরাই এসে তোমার হাতে তুলে দেবেন মেয়েকে।

'ইতিমধ্যে ওর বিয়েটা যদি হয়ে গিয়ে থাকে?'

'বললাম তো হয়নি। গতকাল পাত্রপক্ষের অনিচ্ছায় বিয়েটা ভেঙে গেছে ওর। কেননা ওরা কীভাবে যেন জানতে পেরেছে তোমার প্রতি চন্দ্রার প্রবল আসক্তি আছে বলে।'

চন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'গয়ার পথ কতদূর, কীভাবে যাব সেসবের কিছুই তো আমি জানি না। তা ছাড়া আমি যা শুনেছি তাতে বাবা-মা বেঁচে থাকলে গয়ায় পিণ্ডদান করা যায় না।'

দিব্যপুরুষ বললেন, 'ঠিকই শুনেছ। এক্ষেত্রে অন্যের প্রতিনিধি তুমি। অতএব অসুবিধে নেই। যাই হোক, এখন ঘরে যাও। মনকে শান্ত করো। তোমার চন্দ্রা তোমারই আছে। রাধাবিনোদের সেবার ভার কিছুদিনের জন্য তোমার বাবার হাতে তুলে দিয়ে কাল সকালেই রওনা দাও তুমি। পথে এরাই তোমার সাথি হবে। কোনও বিপদ-আপদ হবে না। গয়ায় গিয়ে আগে প্রেতশিলায় যাবে। তারপরে পিণ্ড দেবে গধাধরের পাদপদ্মে। শেষ পিণ্ড অক্ষয়বটে।' এই পর্যন্ত বলে দিব্যপুরুষ সেই অশরীরীদের বললেন, 'আজ রাতের মধ্যেই তোমরা যার যার নাম গোত্র কাউকে দিয়ে লিখিয়ে ওর ঘরের দোরগোড়ায় রেখে আসবে। এখন যাও।'

চন্দ্রনাথ এবার মনকে শক্ত করে বলল, 'এই প্রেতকুলের আত্মার সদ্গতির জন্য আপনার আশীর্বাদ নিয়ে কাল ভোরেই আমি গয়ার পথে রওনা দেব। তবে একটা কথা, ওই সমস্ত চুরি-ডাকাতির ধন আমি কিন্তু প্রাণ থাকতে নিতে পারব না। আপনার কৃপায় চন্দ্রা যদি আমার ভাগ্যে থাকে তাহলে তাকে আমি বুকে করে রাখব। গাছতলায় থাকব। ভিক্ষে করব। তবু অন্যের হৃত সম্পত্তি আমি ভুলেও প্রত্যাশা করব না। ছুঁয়েও দেখব না ওসব।'

দিব্যপুরুষ হাসলেন। বললেন, 'যা তোমার ইচ্ছা, তাই হবে। ঘুরে তো এসো। এবার আমার যা করণীয় তা আমাকে করতে দাও।'

চন্দ্রনাথ বলল, 'গয়ায় গিয়ে আপনার ব্যাপারে কি কিছু আমি করব?'

'প্রয়োজন হবে না।'

চন্দ্রনাথ এবার ঘরে ফিরে মা-বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে সে রাত্রিটা প্রায় না ঘুমিয়েই কাটাল। পরদিন খুব ভোরে উঠে সঙ্গে কিছু চিঁড়া গুড় বেঁধে প্রেতেদের নাম গোত্র লেখা কাগজ সঙ্গে নিয়ে গয়ার পথে রওনা হল। অশরীরীরাই প্রকট না হয়ে অলক্ষ্যে থেকে পথ নির্দেশ দিতে লাগল। শুধু তাই নয়, ওদের শক্তির প্রভাবে মাঝে মাঝে বাতাসেও উড়িয়ে নিয়ে চলল তাকে।

গয়ায় পিণ্ডদানের পর প্রেতযোনি থেকে মুক্ত হল সবাই। মুক্ত আত্মারা চন্দ্রনাথকে অনেক আশীর্বাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে একে একে বিদায় নিল।

ফেরার পথেও চন্দ্রনাথের কোনও অসুবিধা হল না। কখনও ঘোড়া, কখনও পালকি, কখনও বা গোরুর গাড়ি অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়ে যেতে লাগল। এ সবই যে দিব্যপুরুষের প্রভাবে তা বুঝতে একটুও দেরি হল না।

প্রায় এক মাস বাদে গ্রামে ফিরেই তো অবাক। দেখল এই এক মাসের মধ্যে রাধাবিনোদের একটি পাকা মন্দির তৈরি হয়েছে। ওদের ভিটেয় গড়ে উঠেছে একটি দোতলা মাটকোঠা।

বিস্মিত চন্দ্রনাথ ওর মা-বাবাকে প্রণাম করতেই তাঁরা জড়িয়ে ধরলেন চন্দ্রনাথকে।

চন্দ্রনাথ বলল, 'এসব কী দেখছি? কীভাবে হল এসব?'

মা বাবা দু'জনেই বললেন, 'তুই চলে যাবার পর হঠাৎ একদিন গৌড়দেশ

থেকে এক জমিদার তারকেশ্বর দর্শনে যাওয়ার পথে এক রাত আমাদের গ্রামে আশ্রয় নেন। তখনই এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁদের দেখা দিয়ে কিছু নির্দেশ দেন। তারই ফলে বলতে গেলে রাতারাতি এইসব। আসলে এ সবই রাধাবিনোদের কৃপা। শুধু তাই নয়, ওই একই নির্দেশ পেয়ে পাশের গ্রামের রাজমোহন মুখুজ্যেও একদিন এসে জানিয়ে গেলেন অনেক ভেবেচিন্তে তিনি স্থির করেছেন তাঁর একমাত্র কন্যা চন্দ্রাকে তিনি তোর হাতেই সমর্পণ করবেন।'

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই দেখা গেল বহু লোক-লস্কর সঙ্গে নিয়ে সুদৃশ্য একটি পালকি থেকে নামলেন সস্ত্রীক রাজমোহনবাবু। তাঁরা দু'জনেই চন্দ্রনাথকে আশীর্বাদ করলেন। শুধু তাই নয়, সারাটা দিনদুপুর থেকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাহায্যে পাঁজিপুঁথি দেখে বিবাহের দিনও স্থির করে ফেললেন।

নির্দিষ্ট দিনে মহা ধুমধামে চন্দ্রার সঙ্গে চন্দ্রনাথের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হল। এ সবই যে সেই দিব্যপুরুষের কৃপায় তা চন্দ্রনাথ ছাড়া আর কে-ই বা জানে? তবে আশ্চর্যের ব্যাপার এই, সেই দিনের পর থেকে দিব্যপুরুষের দেখা চন্দ্রনাথ কিন্তু আর একবারের জন্যও পায়নি।

বিশ্বরূপের অলৌকিক দর্শন

অনেকদিন আগেকার কথা। এ দেশ তখনও ব্রিটিশ শাসনাধীন। কলকাতার ভবানীপুর থেকে বিশ্বরূপ ও স্বরূপ নামে দু-বন্ধুতে এল দেওঘরে বায়ু পরিবর্তনে। দীর্ঘ রোগভোগের পর ডাক্তারের নির্দেশেই এখানে আসা। দুর্বলতা বিশ্বরূপের। কিন্তু একা কী করে আসে? তাই বন্ধু স্বরূপকেও সঙ্গে করে নিয়ে এল ও। বিশ্বরূপের বাবা-মার পক্ষে আসা সম্ভব ছিল না। ছোটবোন লিলি নেহাতই নাবালিকা। তাই তার ওপরেও ভরসা করা যায় না। অতএব স্বরূপকেই দায়িত্ব নিয়ে আসতে হল।

তখন ছিল মাঘের শেষ। হাওড়া থেকে মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারে চেপে সকাল ছ'টার সময় যখন জসিডিতে নামল তখন কনকনে ঠান্ডায় জমে গেল দু'জনে। উঃ কী প্রচণ্ড শীত। ট্রেন থেকে নেমেই ওরা স্টেশনের চা-ওয়ালার কাছ থেকে দু'জনে দু-ভাঁড় চা খেয়ে নিল। কী দারুণ সুস্বাদু চা। যেন ক্ষীরের মতো। খেয়ে পরম তৃপ্তিতে ভরে গেল মন।

এরপর একটা টাঙা নিয়ে ওরা চলে এল বনময় বিলাসী টাউনে ওদেরই পরিচিত এক পাণ্ডার বাড়িতে। এরা মিথিলার যজোয়ারী ব্রাহ্মণ। খুব ভদ্র ও নিষ্ঠাবান। বাবা বৈদ্যনাথের পূজারি। মাছমাংস খায় না। তা পাণ্ডা ঠাকুর একটা ঘর দিয়ে বললেন, 'অতদূর থেকে এসেছ তোমরা। আজকের দিনটা এখানে থাকো। কাল আমি তোমাদের অন্য ঘরের ব্যবস্থা করে দেব। না হলে তোমাদের খাওয়া-দাওয়ার খুব অসুবিধা হবে। ওই বাড়িতে কোনও লোকজন নেই। নতুন বাড়ি। এক বাঙালিবাবু বাড়ি তৈরি করেই মারা যান। একরাতও

বাড়িতে থাকেননি তিনি। তোমরাই হবে ওই বাড়ির প্রথম বাসিন্দা।' তারপর বিশ্বরূপকে বললেন, 'তোমার বাবা এখানে একটা বাড়ি কেনার কথাও বলেছিলেন। যদি পছন্দ হয় তো বাবাকে জানিও। তবে দাম কিন্তু তিন হাজার, একপয়সাও কম নয়। দোতলা বাড়ি।'

বিশ্বরূপ বলল, 'বেশ তো। আজকে এখানে থেকে, কাল না হয় ওখানে যাব। তবে আমাদের রান্না বা অন্যান্য কাজের জন্য একজন কাউকে ব্যবস্থা করে দেবেন।'

'সে তোমাকে বলতে হবে না বাবা। আসলে আমি দু-দিনের জন্য বেগুসরাইতে গিয়েছিলাম। কাল এসেছি। ঘরদোর পরিষ্কার করা নেই তাই। না হলে তোমাদের ও বাড়িতেই পাঠিয়ে দিতাম। আজ বিকেলের মধ্যে আমি ঝাড়পোঁছ করে ঘর পরিষ্কার করে দেব। কোনও অসুবিধে হবে না তোমাদের।'

বিশ্বরূপ বলল, 'আমার এই বন্ধুটি অবশ্য বেশিদিন থাকবে না। ওর কলেজ কামাই হবে। দু-চারদিন থেকেই চলে যাবে ও। আমি একা থাকব।'

'ভয় করবে না?'

'ভয় কীসের? বাবা বৈদ্যনাথের দাম। তা ছাড়া আপনারা তো আছেনই।'

'তা ঠিক। তবে আমি তোমার জন্য ভাল লোকেরই ব্যবস্থা করে দেব। আজ তোমাদের দু-বন্ধুর খাওয়াদাওয়া আমার এখানেই।' বলে বিদায় নিলেন পাণ্ডা ঠাকুর।

বিশ্বরূপ এর আগে দু-বার এসেছে এখানে। তাই এই এলাকার পথঘাট ওর সবই পরিচিত। স্বরূপের আসা এই প্রথম। জসিডি থেকে এইটুকু পথ আসতেই মন ভরে গেছে ওর। ঘরে মালপত্র রেখে ওরা এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ানোর জন্য শিবগঙ্গার পাশ দিয়ে মন্দির চত্বরে এল। তারপর ঘড়িঘরের সামনে এসে একটা দোকানে বসে জলযোগ পর্ব সেরে নিল। এরপর হাঁটতে হাঁটতেই চলে গেল দূরের নন্দন পাহাড়ের দিকে। দেওঘরের প্রাণকেন্দ্রই নন্দনপাহাড়। অনেকটা সময় সেখানে কাটিয়ে ওরা আবার ফিরে এল পাণ্ডার বাড়িতে। সেখানেই স্নান, খাওয়া সেরে দুপুরে বিশ্রাম।

বিকেলে পাণ্ডা ঠাকুর বললেন, 'শোনো বাবুজিরা আমি তোমাদের জন্য

অন্য ঘরের ব্যবস্থা করেছি। সে জায়গাটা এখান থেকে একটু দূরে। তোমরা বাইরে যাওয়ার পর পদ্মা-মা এসেছিল। সে বারণ করল ওই বাড়িতে যেতে। তাই পদ্মা-মার ওখানেই পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। কেন না যে বাড়ির মালিক বাড়ি তৈরির পর রাত্রিবাসও করেননি, সেখানে তোমাদের না পাঠানোই ভাল। তা ছাড়া বন্ধু চলে গেলে ওখানে যদি কোনও ভয়ের ব্যাপার ঘটে তখন আমাকে দোষারোপ করবে সবাই। তা ছাড়া তোমরা তো শুধু বেড়াতে আসনি। এসেছ স্বাস্থ্যোদ্ধারে। তাই কুণ্ডাতেই থাকা ভাল। ওখানকার জলের গুণে শরীর, স্বাস্থ্য-দুই-ই ভাল থাকবে।'

বিশ্বরূপ বলল, 'যা আপনি বলবেন, যেমনটি বলবেন তেমনই হবে। এখানে আমরা আপনাকেই চিনি। আর কাউকে না।'

অতএব আবার সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে পাণ্ডাজির সঙ্গে টাঙায় চেপে বসল দু'জনে।

বিলাসী টাউন থেকে কুণ্ডা প্রায় আধঘণ্টার পথ। তাই ওরা বেলাবেলিই পৌঁছে গেল কুণ্ডাতে। এই জায়গাটা একেবারে গ্রামের মতো। বেশ কয়েকটি পাকা বাড়িও আছে এখানে। আছে বিখ্যাত কুণ্ডেশ্বরী মায়ের মন্দির। বহু দূরের ত্রিকূট পাহাড়, তপোবন পাহাড় ভালই নজরে আসে এখান থেকেই। আর পুরো এলাকাটি বনময়। দারুণ শান্তির পরিবেশ এখানে।

কুণ্ডা থেকে যে মোরাম বিছোনো পথটি তপোবন পাহাড়ের দিকে গেছে সেদিকেই শেষ বাড়িটি পদ্মা-মার। বাড়িটি দোতলা। এই চত্বরে ওঁর একটি মুদিখানার দোকানও আছে। সবকিছুই পাওয়া যায় সেখানে। এমনকী কেরোসিন তেল পর্যন্ত।

পাণ্ডাজি টাঙা থেকে নামতেই ছুটে এলেন পদ্মা-মা। বললেন, 'আইয়ে পণ্ডিতজি। ও দোনো আ গয়ে?'

বিশ্বরূপ ও স্বরূপ তখন নেমে পড়েছে টাঙা থেকে। টাঙাওয়ালা ওদের ব্যাগ নামিয়ে একটা টাকা নিয়ে বিদায় নিল।

মধ্যবয়সি সধবা পদ্মা-মা রূপের খনি যেন। মুখভরা হাসি। ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আও বেটা। উপর চলো।' বিশ্বরূপ স্বরূপ-দুজনেই পদ্মা-মা-র সঙ্গে ওপরে উঠল। পাণ্ডাজিও এলেন।

ঘর দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল ওরা। কুণ্ডার শেষপ্রান্তে বাড়ি। তাই বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ঘন শালবন। ত্রিকূট, তপোবন সব।

বিশ্বরূপ বলল 'বিলাসী টাউনের চেয়ে কুণ্ডা অনেক ভাল।'

'ঘর পসন্দ হয়েছে?'

'হাঁ মাজি। এই ঘরের ভাড়া কত?'

'কিতনা দিন রহোগে তুম?'

'পুরা এক মাহিনা। হাম আকেলে।'

'ইয়ে লেড়কা নেহি রহেগা?'

'ও দো-দিন রহেগা। হামকো পঁহুছানে আয়া।'

'তো ঠিক হ্যায়, এক মাহিনাকে লিয়ে বিশ রুপিয়া লাগেগা।'

বিশ্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে কুড়িটা টাকা পদ্মামার হাতে দিতেই পদ্মা-মা বললেন, 'তুমহারা কাজকামকে লিয়ে এক লেড়কিকো ভেজুঙ্গি। যানেকা ওয়াক্ত উসিকো পাঁচ রুপিয়া দে দেনা।'

ব্যাস। সুন্দর পরিবেশে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে গেল।

পদ্মা-মা, পাণ্ডাজি-দু'জনেই বিদায় নিলেন।

পাশাপাশি দুটো ঘর। তারই একপাশে বাথরুম ও কিচেন। আর একটি ঘরে ভাড়া নিলে একই কিচেনে রান্না করতে হবে দু-ঘরের যাত্রীকে। তবে আর কেউ আসবে বলে মনে হয় না।

ঘরের মধ্যে একটি বড়ো তক্তাপোশ আছে। নতুন একটি তোশকও রয়েছে সেখানে। আর আছে দুটো বালিশ ও মশারি।

ওরা তোশক পেতে তার ওপর বাড়ি থেকে নিয়ে আসা বেডশিট বিছিয়ে নিল। মশারি টাঙানোর জন্য কিছু পেটো দড়ি নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে। যদিও তার কোনও প্রয়োজন হবে মনে হল না। ঘরে আলো ও পাখার ব্যবস্থাও আছে। ওই প্রচণ্ড শীতে অবশ্য পাখা ওদের কোনও কাজেই লাগবে না। তবুও ব্যবস্থা দেখে খুব ভাল লাগল।

ওরা এবার বাথরুমের কলে মুখ হাত ধুয়ে নীচে এল চা খেতে। পদ্মা-মার দোকানের পাশেই চায়ের দোকান। তার পাশেই একটি মিষ্টির দোকানে মিষ্টি ছাড়াও শিঙাড়া, কচুরি, চপ, বেগুনিও ভাজা হচ্ছে।

ওরা চা-বিস্কুট খেয়ে কুণ্ডেশ্বরী মন্দিরে এল। এই অঞ্চলে স্বাস্থ্যোদ্ধারে আসা বহুযাত্রী ও স্থানীয়রা রোজই মন্দিরে আসেন। আর এখানকার ইঁদারা থেকে জল ভরে নিয়ে যান খাবার জন্য।

বিশ্বরূপ বলল, 'এই জলের গুণেই মানুষ এদিকে আসে। আমিও এই জলই খাব। অবশ্য কোথাও থেকে একটা কুঁজো জোগাড় করতে হবে।'

স্বরূপ বলল, 'এমন সুন্দর জায়গায় কখনও আসতে পারব তা স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু আমার যে উপায় নেই রে। আজ, কাল, পরশু, তেরাত্রি বাস করেই চলে যেতে হবে।'

বিশ্বরূপ বলল, 'আক্ষেপ করার কিছু নেই। জায়গাটা তো চেনা রইল। পরে কখনও ছুটিছাটা পেলে বাড়ির লোকেদের নিয়ে বেশ কিছুদিন থেকে যাবি।'

স্বরূপ বলল, 'পরের কথা পরে। এখন যে যেতে মন চাইছে না।'

এইভাবে কথা বলতে বলতে ওরা এদিক-সেদিক ঘুরে আবার ওদের ঘরেই ফিরে এল।

ওরা আসার সঙ্গে সঙ্গে পেঁচিয়ে শাড়ি পরা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা একটি মেয়ে কুঁজো ভরতি জল নিয়ে ওদের ঘরে রেখে গেল। বলল, 'রাতকো খানা হিঁয়া বনেগা না দুকান সে আয়েগা?'

বিশ্বরূপ বলল, 'আজ তো এখানে সেরকম কোনও ব্যবস্থা করা যাবে না। তাই দোকান থেকেই নিয়ে আসব।' মেয়েটি আর কিছু না বলে চলে গেল।

ওরা দু-বন্ধুতে অনেকক্ষণ ধরে নিজেদের মধ্যে গল্প করে নীচের একটি দোকান থেকে ডাল-রুটি কিনে আনল।

সে রাতটা বেশ আরামেই ঘুমিয়ে কাটাল। তবে প্রচণ্ড শীতের জন্য মাঝে মাঝে কাঁপুনি ধরেছিল খুব। যদিও কম্বল, চাদর ইত্যাদি বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল। তবুও একটা লেপ হলে যেন ভাল হত।

পরদিন সকালে নীচে নামলে পদ্মা-মা বললেন, 'তোমাদের কোনও তকলিফ হয়নি তো বাবুরা?'

বিশ্বরূপ বলল, 'কিছুমাত্র নয়। খুব আরামে কাটিয়েছি আমরা। রসুই বানানোর জন্য একটা স্টোভ তো দরকার।'

পদ্মা-মা হেসে বললেন, 'শুধু স্টোভ? মিট্টি কা তেল লাগবে না? হাঁড়ি, কড়া-এসবও তো লাগবে। সব ব্যবস্থাই আছে এখানে। বিন্দু সব সময়মতো পৌঁছে দেবে তোমাদের ঘরে। শুধু বাজার দোকানটা তোমরা নিজেরা করে নিও।'

ব্যাস। দু-বন্ধুতে এখানকার গাঢ় দুধের সুস্বাদু চা খেয়ে যেদিকে তপোবন পাহাড় সেদিকের পথ ধরে হেঁটে চলল বেশ কিছুদূর পর্যন্ত। তারপর অনেকটা সময় শীতের রোদ্দুর গায়ে মেখে পাহাড়, পর্বতের শোভা দেখে বাসায় ফিরল দু'জনে। এসে দেখল বিন্দু ততক্ষণে সবরকমের ব্যবস্থাই করে ফেলেছে। ওরা শুধু চাল, ডাল, তেল, নুন, আটা ও কাঁচা বাজার করে নিয়ে এল। কিন্তু এখানে না আছে মাছ, না আছে কোনও মাংসের দোকান।

বিন্দু বলল, 'আণ্ডা খাবে বাবুজি? আমার ঘরে অনেক আণ্ডা আছে।'

বিশ্বরূপ বলল, 'বেশ তো নিয়ে এসো।'

বিন্দু তখনই চলে গেল ডিম আনতে। একটু পরেই দশটা ডিম নিয়ে এসে বলল, 'এক রুপিয়া দিজিয়ে।'

এক টাকার একটি কড়কড়ে নোট ওর হাতে দিতেই দারুণ খুশি হল ও।

বিশ্বরূপ বলল, 'আজ শুধু আলুভাজা, বেগুন ভাজা আর ডিমের কারি হোক। রাতে রুটি, ফুলকপির তরকারি বানিয়ে দিও।'

বিন্দু বলল, 'ভঁইষা ঘিউ আনিয়ে দাও না, রাতে তাহলে চাপাটি বানিয়ে দেব।'

স্বরূপ বলল, 'তাই বানিয়ে দিও। না হলে স্টোভে রুটি ভাল হবে না।' বলে ও নীচের দোকান থেকে বেশ কয়েকটা শিঙাড়া, কচুরি নিয়ে এল। বিন্দুকেও অবশ্য ভাগ দেওয়া হল তা থেকে।

ওরা কলকাতা থেকে ভাল চা নিয়ে এসেছিল। তাই চায়ের জন্য আর দোকানে যেতে হল না। বিন্দু যত্ন করে চা বানিয়ে ফেলল অভ্যস্ত হাতে।

দুপুরে স্নানাহার সারার পর অল্প বিশ্রাম। তারপর কুণ্ডেশ্বরী মন্দিরে একটু বসে একটা রিকশা নিয়ে তপোবন পাহাড়ে যাওয়া। সন্ধ্যায় ফিরে এসে আরতি দেখা। রাতে বিন্দুর তৈরি চাপাটি, আলু-কপির তরকারি আর দোকান থেকে কিনে আনা ছানার গজা খেয়ে শয্যাগ্রহণ এবং এক ঘুমে রাত কাবার।

এইভাবে তিনটে দিন ভালই কাটল। চারদিনের দিন বিদায় নিল স্বরূপ। একটা টাঙা নিয়ে বিশ্বরূপ গেল ওকে ট্রেনে তুলে দিতে। বেলা দশটায় ট্রেন। এই ট্রেন আসানসোল পর্যন্ত যাবে। তারপর ওখান থেকে অন্য ট্রেনে হাওড়া।

জসিডিতে স্বরূপকে ট্রেনে চাপিয়ে বিশ্বরূপ বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে এসে দর্শন ও পুজো দিল। পরে ওখানকার প্যাঁড়া গলি থেকে দেওঘরের বিখ্যাত প্যাঁড়া কিনে আবার একটা টাঙা নিয়ে চলে এল কুণ্ডাতে। দু'জনে বেশ ছিল। এখন একা হতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল।

বিন্দু বলল, 'ওই বাবুজি আর আসবে না?'

'না, পরে হয়তো কখনও আসবে। এখন আর আসবে না।'

বিন্দু আর কোনও কথা না বলে নিজের কাজ করতে লাগল।

বিশ্বরূপ বলল, 'তুমি কিন্তু দু'জনের মতোই রান্না করবে। আজ থেকে আমার এখানেই খাবে তুমি।'

বিন্দু বলল, 'তুমি যদি বল তাহলে রাতেও থাকতে পারি আমি। পাশের ঘরে শোবো।'

'না এমন কথা বলব না। তুমি মেয়ে তো। একমাস থেকে আমি চলে যাব। তোমার তখন বদনাম হবে।'

বিন্দু বলল, 'ও'।

যাইহোক দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে বিকেলে একবার মন্দিরে এসে বসল বিশ্বরূপ। সন্ধ্যায় আরতি দেখে মন্দিরের ডান দিকের পথ ধরে একটু এগোতেই দেখল ময়ূরপঙ্খী শাড়ি পরা এক তরুণী একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তরুণীর যেমনই অঙ্গভরা রূপ, তেমনই অপূর্ব মুখশ্রী। একবার দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। কে এই তরুণী? এই ক'দিনে একবারও তো দেখা যায়নি ওকে।

বিশ্বরূপ আরও একটু কাছে আসতেই তরুণী বলল, 'মনখারাপ?'

ওর কথায় চমকে উঠল বিশ্বরূপ। বলল, 'আপনি কী করে জানলেন?'

তরুণী বলল, 'বাঃ জানব নাই বা কেন? ক'দিনই তো দেখছি আপনাদের দু'জনকে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতে। আজ সকালে বন্ধুকে নিয়ে স্টেশনে গেলেন। এখন দেখছি একা। থাকবেন ক-দিন?'

'মাসখানেক তো থাকবই।'

'চেঞ্জে এসেছেন? ভাল। এখানকার জল-হাওয়ায় দু-দিনেই চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।'

'আপনিও কি চেঞ্জে এসেছেন?'

'এসেছিলাম। এখন এখানেই থাকি। মনের মতো জায়গা। কাল আবার দেখা হবে কেমন?' বলেই হন হন করে এগিয়ে কোথায় যেন চলে গেল।

এই রহস্যময়ী তরুণীর প্রভাব মন থেকে মুছে ফেলতে পারল না বিশ্বরূপ। কেমন যেন মায়া ধরিয়ে দিয়ে গেল ওর অন্তরে। ওর চলে যাওয়া পথের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিশ্বরূপ যখন ফিরে আসছে, তখন দেখল কুণ্ডেশ্বরী মন্দির থেকে সাজি ভরতি বেলপাতা নিয়ে এক অতি সুদর্শন যুবক হন হন করে এগিয়ে আসছে। এই প্রচণ্ড শীতেও তার খালি গা। গলায় পইতে। তার মানে ইনি কোনও মন্দিরের পূজারি। যুবক ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে তরুণী যে পথে গেছে, সেদিকেই দ্রুত এগিয়ে গেল। নিশ্চয়ই ওখানে কোনও দেবস্থান আছে। তা বলে এই রাতের অন্ধকারে? ও আর বাইরে না থেকে বাসায় ফিরল। কেন না চারদিকের পরিবেশ তখন নিঝুম।

ও ফিরে এলে বিন্দু ওকে চা করে খাওয়াল। তারপর গত রাতের মতো চাপাটি ও ফুলকপির তরকারি বানিয়ে একটা বেগুনও পোড়াল।

বিশ্বরূপ বেশি রাত না করে গরম গরম খেয়ে নিল। বিন্দুও খেতে বসল ওর সঙ্গে। সকালে যে প্যাঁড়া এনেছিল তা থেকেও দুটো ভাগ দিল বিন্দুকে।

আহার পর্ব সমাধা হলে বিন্দু বলল, 'আমি তাহলে আসি বাবুজি। একা থাকতে ভয় করবে না তো?'

'ভয় করলে চেঁচিয়ে ডাকব পদ্মা-মাকে। উনি তো দোকানেই থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

বিশ্বরূপ আবার বলল, 'আচ্ছা পদ্মা-মা-র স্বামীকে তো দেখছি না। উনি কোথায় থাকেন?'

'উনি থাকেন কাশীতে। ওখানে একটা মন্দিরের পূজারি উনি। মাঝে মাঝে আসেন। শুধু ওই দোকান আর বাড়ি ছেড়ে কর্তামা যেতে পারেন না কোথাও।'

বিন্দু চলে গেলে বিশ্বরূপ আপাদমস্তক কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল টান

হয়ে। স্বরূপের জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল। অথচ উপায়ও নেই। যেতে তো হবেই ওকে। সন্ধ্যায় দেখা সেই সুন্দরী তরুণীর কথাও মনে পড়ল, কেনই বা সে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল, কেনই বা কথা বলল, বনপথে কোথায় হারাল সে কিছুই ভেবে পেল না। সুদর্শন যুবকও ওর কাছে বিস্ময়ের। এই প্রচণ্ড শীতে খালি গা এ কি ভাবা যায়?

যাইহোক নানারকম ভাবতে ভাবতে এক সময় দরজায় টকটক শব্দ। উঠে গিয়ে দরজা খুলেই দেখল সেখানে একটা মোটা লেপ রেখে গেছে কে। নিশ্চয়ই পদ্মা-মা। কিন্তু নীচের দরজায় তো খিল দিয়ে এসেছিল। তাহলে কে?

ও আর কোনও ভাবনাচিন্তা না করে লেপটা বিছানায় এনে কম্বলের ওপর চাপিয়ে আরামে নিদ্রা গেল।

খুব ভোরে পাখিদের ডাকে ঘুম ভাঙল বিশ্বরূপের। ও ভালরকমের গরমের পোশাক পরে মুখ-হাত ধুয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল। নেমে দেখল দরজায় খিল দেওয়া নেই। এবার একটু বিস্ময় বোধ করল ও। এমন তো হওয়ার কথা নয়।

যাইহোক, বাইরে এসে সেই চায়ের দোকানে বসে বড় ভাঁড়ের একটা কাপ চা খেল বেশ তৃপ্তি করে। তারপর তপোবন পাহাড়ের দিকে যে পথটা চলে গেছে, সেই পথ ধরে আপন মনে এগিয়ে চলল।

খানিক যাওয়ার পরই কানে এল, 'এই যে শুনছেন?'

বিশ্বরূপ পিছু ফিরে দেখল সেই তরুণী। দেখেই থমকে দাঁড়াল ও।

তরুণী কাছে এসে বলল, 'মর্নিং ওয়াক করছেন বুঝি?'

বিশ্বরূপ হেসে বলল, 'ঠিক তাই।'

'গলায় মাফলার নেই। মাঙ্কি ক্যাপ নেই। ওগুলোর কোনও প্রয়োজন নেই বুঝি আপনার কাছে?'

'আছে। তবে কিনা বাড়ি থেকে আনতে ভুলে গেছি।'

'তা তো যাবেনই। বিশ্বজোড়া রূপ আপনার। ভুল তো হবেই।' কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা মাফলার ও একটা মাঙ্কি ক্যাপ বের করে বলল, 'এটা এখনই পরে ফেলুন। আমার উপহার।'

বিশ্বরূপ চমকিত হল তরুণীর ব্যবহারে। উনি ওর নাম জানলেন কী করে?

তার ওপর এই উপহার ওকেই বা দিলেন কেন উনি। তাই অবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তরুণীর মুখের দিকে। তারপর সম্ভ্রম রক্ষার্থে মাঙ্কি ক্যাপ পরে গলায় মাফলারটা জড়িয়ে বলল, 'কেমন লাগছে?'

'খুব ভাল লাগছে।' বলেই যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল।

এক অনাস্বাদিত সুখের পুলকে ভরে উঠল বিশ্বরূপের বুকের ভেতরটা। প্রথমত তরুণীকে ওর দারুণ ভাল লেগেছে। তার ওপর ওর এই নিজের থেকে এগিয়ে আসা ওকে যেন ব্যাকুল করে তুলল। বলতে গেলে ওর জীবনে এই প্রথম কোনও এক অনাত্মীয়া নারী।

একটু পরে রোদ উঠলে ও আবার যথাস্থানে ফিরে এল।

পদ্মা-মা তখন দোকান সাজিয়ে বসেছেন। বিশ্বরূপ বলল, 'কাল আপনি লেপটা দিয়ে খুব ভাল করেছেন। যা আরামে ঘুমিয়েছি না কাল?' পদ্মা-মা প্রথমে একটু চমকে উঠলেন, 'লেপ।' পরে বললেন, 'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিন্দুকে দিয়ে পাঠিয়েছিলাম।'

'কিন্তু আমি তো নীচের দরজায় খিল দিয়ে শুয়েছিলাম। ও ভেতরে ঢুকল কী করে?'

'বিন্দুকে আমি নীচের ঘরে শুতে বলেছিলাম। বন্ধু ছিল ঠিক ছিল। এখন তোমার একা থাকা ঠিক নয়। যে ক-দিন তুমি থাকবে ও রোজই শোবে ওখানে। তুমি তোমার ঘরে খিল দিয়ে শোবে।'

'কিন্তু।'

'কোনও কিন্তু-টিন্তু নেই। পণ্ডিতজিকা বাত হমে মান না হি পড়েগা।'

অতএব আর কোনও কথা নয়। বিশ্বরূপ ওর ঘর থেকে বাজারের থলি নিয়ে এসে কাঁচা বাজার করল কিছুটা তারপর বিন্দু এলে ওর হাতে বাজারের থলিটা দিয়ে বলল, 'যা পার রেঁধে নাও।'

বিন্দু বলল, 'বাবুজি, আমি তোমার জন্যে একটা মোরগা মেরে এনেছি, খাবে না?'

'তুমি রাঁধতে পারলেই খাব। কত দাম মোরগাটার?'

'আটআনা পয়সা দেবেন তাহলে।'

বিশ্বরূপ ওর হাতে আটআনা পয়সা দিয়ে আবার বাইরে এল। সামনে

সেই দোকানটায় বসে বেশ কয়েকটা গরম কচুরি আর জিলিপি খেয়ে বিন্দুর জন্যও নিয়ে এল।

খুব খুশি হয়ে বিন্দু বলল, 'বাবুজি, তুমি যখন চান করবে তখন বলবে আমি তোমার জন্য জল গরম করে দেব। নাহলে এত শীতে ঠান্ডা জলে চান করলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে তোমার।'

বিশ্বরূপ বলল, 'খুব ভাল হয় তাহলে।'

এরপর আর ঘরে না থেকে আবার শীতের রোদ গায়ে মাখতে মাখতে অনেক বেলা পর্যন্ত এদিক-সেদিক করে ঘুরে বেড়াল বিশ্বরূপ। তারপর ঘরে এসে স্নানাহার পর্ব সেরে নিল।

আলুভাজা, ভাত আর মুরগির মাংস দারুণ রেঁধেছে মেয়েটা।

তৃপ্ত বিশ্বরূপ বলল, 'বিন্দু, তুমি যার ঘরে যাবে তোমার হাতের রান্না খেয়ে তার জীবন কিন্তু ধন্য হয়ে যাবে।'

বিন্দু বলল, 'কারও ঘরনি হবার সৌভাগ্য কি আমার কখনও হবে?'

'নিশ্চয়ই হবে। এত সুন্দর দেখতে তোমাকে।'

'কী করে হবে বাবুজি, আমরা যে গরিব।'

'সময় যখন আসবে তখন গরিব-বড়লোকের ব্যবধান ঘুচে যাবে। তা যাক, কাল রাতে তুমি আমার দরজার সামনে লেপটা রেখে গিয়ে ভালই করেছ।'

বিস্মিত বিন্দু বলল, 'আমি! আমি লেপ পাব কোথায়?'

'সে কী! পদ্মা-মা যে বললেন।'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তা বাবুজি আজ রাতে কিন্তু আমি এখানেই শোবো। শুধু রাতে নয়, দিনেও। আপনি যে ক-দিন থাকবেন সে ক-দিন থেকে যাব আমি।'

বিশ্বরূপ খুশি হয়ে বলল, 'তবে তো ভালই হয়। বন্ধু নেই, তাই বাকি সময়টা তোমার সঙ্গেই গল্প করে কাটাব।'

খুশিতে উজ্জ্বল হল বিন্দুর মুখ।

তরুণীর মুখও বার বার মনের ক্যানভাসে ফুটে উঠতে লাগল এবার। তাই বিকেল হতেই বিশ্বরূপ কুণ্ডেশ্বরীর মন্দিরে এসে বসল। যদি আর একবার

ওর সঙ্গে দেখা হয় সেই আশায়। কিন্তু না, এখানে অনেক দর্শনার্থীর সমাগম থাকলেও তরুণী নেই।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর বাইরের দোকানে গিয়ে এক ভাঁড় চা খেয়ে দেহটাকে সতেজ করে নিল বিশ্বরূপ। তারপর মন্দিরের বিপরীত দিকের পথ ধরে চলতে লাগল বনময় প্রদেশের দিকে।

হঠাৎই শুনতে পেল, 'আমার দেওয়া উপহার তোমার পছন্দ হয়নি তাই না?'

বিশ্বরূপ বলল, 'সে কী! এ কথা কে বলল আপনাকে?'

'তাহলে পরেননি কেন?'

'ওটা ভোরের জন্য রেখেছি।' তারপর বলল, 'আপনার নামটা জানতে পারি কি?'

'আমার নাম অলকানন্দা। সবাই আমাকে অলকা বলেই ডাকত।'

'এখন ডাকে না?'

'ডাকবে কী করে? আমি এখন সবার থেকে অনেক দূরে আছি।'

এমন সময় সেই সুদর্শন যুবককে দ্রুত এদিকে আসতে দেখা গেল। সে এসেই একবার প্রসন্ন বদনে মৃদু হেসে তাকাল বিশ্বরূপের দিকে। তারপর বলল, 'একা একা সন্ধের পর এদিকে একদম এসো না। ওই যে দেখছ পাহাড়টা ওখান থেকে ছোটখাটো বাঘ-ভালুক হঠাৎ করে এসে পড়ে।' তারপর তরুণীকে বলল, 'অলকা তুমি এখানে কী করছ? আরতির সময় হয়েছে মন্দিরে যাও।'

তরুণী উঠে মন্দিরের দিকে গেল। বিশ্বরূপও মন্দিরে এল। ব্রাহ্মণ যুবক হারিয়ে গেল বনান্তরালে।

আরতি দর্শনের পর ঘরে এসে বিশ্বরূপ আলো জ্বেলে বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে তরুণীর কথাই চিন্তা করতে লাগল। ওই রহস্যময় যুবকও ওকে ভাবিয়ে তুলেছে এখন।

এমন সময় বিন্দু এসে বলল, 'বাবুজি রাতে তুমি কী খাবে? ভাত না চাপাটি? সকালের মাংস অনেকটা রয়ে গেছে। ভাতও আছে খানিকটা।'

'সকালের ভাত আমি খাব না। ওটা তুমি খেয়ে নাও। আমার জন্য বরং

বাইরের দোকান থেকে গোটা চারেক রুটি নিয়ে এসো' বলে ওকে চারআনা পয়সা দিয়ে আবার তরুণীর কথা ভাবতে লাগল বিশ্বরূপ।

বিন্দু চলে যাওয়ার পরই যে এসে ঘরে ঢুকল তাকে দেখেই পুলকে ভরে উঠল সারা শরীর, 'এ কী আপনি!'

তরুণী ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, 'চু-উ-প। এরা জানতে পারলে খুব রাগ করবে। আমাকে একদম পছন্দ করে না এরা। আমি যাতে না আসি সেজন্যই বিন্দুকে এখানে রেখেছে পদ্মা-মা। বিন্দু খুব ভাল মেয়ে।'

'ওর মতো মেয়ে হয় না।'

তরুণী এবার কাঁচা শালপাতায় মোড়া কিছু একটা ঘরের কোণে রেখে বলল, 'সময় মতো খেয়ে নিও এটা। বাসু ঠাকুর পাঠিয়েছে তোমার জন্য।'

বিশ্বরূপ বলল, 'বাসু ঠাকুর কে?'

'ওমা! সেই যাকে তখন দেখলে তুমি। খুব ভাল মানুষ উনি। আজন্ম ব্রহ্মচারী।' তরপর বলল, 'কাল রাতে যে লেপটা দিয়ে গিয়েছিলাম সেটা গায়ে দিয়েছেন তো?'

বিস্ময় প্রকাশ করে বিশ্বরূপ বলল, 'একবার আপনি একবার তুমিটা কীরকম বেখাপ্পা লাগছে। যেকোনও একটা বলো।'

'কী বলব তবে?'

'দু'জনেই আমরা বন্ধুর মতো। তুমিই বলবে।'

'বেশ, তুমিই বলব।'

'এবার বলো কাল রাতে কখন তুমি দিয়ে গেলে লেপটা?'

'তুমি শুয়ে পড়ার পর।'

'দরজায় নক করেই চলে গেলে। আমার সঙ্গে দেখা করলে না কেন?'

'বাঃ রে, তাহলে যে জানাজানি হত। বলেছি তো, এরা আমাকে কেউ পছন্দ করে না।'

'কেন করে না?'

'পরে সবই জানতে পারবে।' বলেই তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল তরুণী।

একটু পরেই বিন্দু ফিরে এলে খাওয়া-দাওয়ার পাটটা চুকিয়ে নিল বিশ্বরূপ। তরুণীর আবির্ভাবের কথা কিছুই বলল না। ঘরের দরজা বন্ধ করে

তরুণীর নিয়ে আসা শালপাতার সেই মোড়কটা খুলে দেখল নানারকমের সুস্বাদু মিষ্টান্ন রয়েছে সেখানে। আছে ছোট একটা ভাঁড় ভরতি ক্ষীর। এসব ঠাকুরের প্রসাদ নিশ্চয়ই। তাই ভরা পেটেই একটু একটু করে খেয়ে নিল সেগুলো।

সে রাতটা আরামে ঘুমিয়ে কাটিয়ে পরদিন নিশিভোরেই উঠে পড়ল বিশ্বরূপ। শাল, সোয়েটার, মাফলার, মাঙ্কি ক্যাপ সবকিছু পরে বাইরে বেরিয়ে এল। বিন্দু তখনও নীচের ঘরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

ও যখন বাইরে এল চারদিকের অন্ধকার ভাবটা তখনও কাটেনি। তবে চায়ের দোকানটা ঠিক খুলে গেছে। দু'জন এদেশীয় লোক দোকানের বেঞ্চে বসে চা খাচ্ছে তখন। বিশ্বরূপও এক ভাঁড় চা খেয়ে চাঙ্গা হল একটু। তারপর আকাশ পরিষ্কার হলে সেই বনভূমির দিকে সাহসে ভর করে এগিয়ে চলল। পরপর দু-দিন যে পথে সে ব্রহ্মচারীকে যেতে দেখেছিল।

বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর একটি টিলা পাহাড় চোখে পড়ল ওর। সেই পাহাড়ে ছোট একটি গুহাকৃতি অংশের মধ্যে দেখা গেল ধ্যানমগ্ন সেই যুবককে। সামনে একটি শিবমূর্তি। গুহার বাইরে লাল শালুর পতাকা পত পত করে উড়ছে।

বিশ্বরূপ যখন এক দৃষ্টে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে সেদিকে তখনই শুনতে পেল, 'এখন না। সন্ধের পর এসো। তোমাকে আরও প্রসাদ দেব। তুমি দুর্বলতা কাটিয়ে আবার সেই আগের মতো হয়ে যাবে।'

বিশ্বরূপ আর রইল না সেখানে। এদের ব্যাপার-স্যাপার সবই কেমন রহস্যময়।

সেদিনটাও সেই একইভাবে কাটল। সারাদিনে তরুণীর মুখদর্শন একবারের জন্যও হল না। তবে, সন্ধ্যায় দেখা হল মন্দিরে। ওকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলল, 'এসো।'

তরুণীর সঙ্গ নিয়ে কিছু দূর আসার পর বিশ্বরূপ বলল, 'গতকাল উনি তো আমাকে এ পথে আসতে মানা করেছিলেন।'

'সে তো একা একা। আজ আমি আছি। তা ছাড়া উনি তোমাকে সন্ধের পর আসতে বলেছিলেন।'

'তুমি কী করে জানলে?'

'আমি সব জানি। জানি বলেই তো সঙ্গে করে নিয়ে এলাম তোমাকে। আবার পৌঁছেও দিয়ে আসব। কোনও ভয় নেই তোমার।'

'ভয় আমার এমনিতেও নেই।'

তরুণী বলল, 'খুব যে।'

তরুণীর সঙ্গে সন্ধ্যার অন্ধকারে পার্বত্য বনপথ ধরে যেতে যেতে বারবারই মনে হতে লাগল এই নির্জন প্রান্তরে ওই ব্রাহ্মণ ও তরুণী ছাড়া আর কেউ নেই কেন? সাধক না হয় ওই ফাটলের মতো গুহাতে কোনও রকমে রয়ে যেতে পারেন কিন্তু তরুণী? সে থাকে কোথায়?

তরুণীর সঙ্গ নিয়ে একসময় যথাস্থানে পৌঁছল বিশ্বরূপ। গিয়ে দেখল সে কী অপরূপ রূপ। চাঁদের আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত সেখানে। অজস্র মোমবাতি জ্বলছে দেবস্থানে। কত নারী-পুরুষ করজোড়ে বসে আছে সেই ছোট্ট ও সংকীর্ণ গুহামুখের সামনে আর পরম রূপবান বাসুদেব ঠাকুর যে কিনা আজন্ম ব্রহ্মচারী এক মনে আরতি করে চলেছে শিবমূর্তির। কাঁসর বাজছে, ঘণ্টা বাজছে, ডম্বরুর ধ্বনি হচ্ছে কিন্তু কারা যে এসব বাজাচ্ছে তা কিছুই বুঝতে পারল না বিশ্বরূপ। অবশ্য বোঝার চেষ্টাও করল না। তরুণী শুধু ওর থেকে একটু ব্যবধান রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরে আরতি শেষ হলে ব্রাহ্মণ অনেকটা প্রসাদ কাঁচা শালপাতার ঠোঙায় মুড়ে বিশ্বরূপের হাতে দিয়ে বলল, 'এবার যেতে পারো। এই প্রসাদের ভাগ কিন্তু কাউকে দেবে না। এর প্রভাবে তোমার শরীরে কোনও রোগব্যাধি থাকবে না। কাল থেকেই তুমি তা বুঝতে পারবে। অনেক বলবান হবে তুমি। ভাল থেকো। আর একটা কথা, এখান থেকে যাবার সময় পিছু ফিরে তাকাবে না।'

বিশ্বরূপ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করতে গেলে ব্রাহ্মণ বলল, 'প্রসাদ হাতে প্রণাম করতে নেই। এতে বিগ্রহের অবমাননা করা হয়।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিশ্বরূপ প্রসাদ কপালে ঠেকিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য পা বাড়াতে ঘন অন্ধকারে ভরে গেল চারদিক। মনে হল এতক্ষণ ধরে যা ও দেখল তা সবই স্বপ্ন। শুধু অলকানন্দা নামের সেই রহস্যময়ী তরুণী ছাড়া আর কেউ নেই এখানে।

তরুণীকে অনুসরণ করে ও যখন লোকালয়ে ফিরল তখন দেখল তরুণীও ওর পাশে নেই। বিস্মিত বিশ্বরূপ জোর গলায় ডাকল, 'অলকা! অলকানন্দা-!' কিন্তু কোথাও থেকে ওর কোনও সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না।

কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যেই বাসায় ফিরল বিশ্বরূপ। প্রসাদটা এক জায়গায় রেখে কেমন যেন আনমনা হয়েই বসে রইল চুপচাপ। একটু পরে বিন্দু এসে বলল, 'তুমি এভাবে বসে আছ কেন বাবুজি? তোমার শরীর খারাপ?'

'না। মায়ের জন্য বড় মন কেমন করছে। ভাবছি কালই চলে যাব।'

শুনেই মুখটা ম্লান হয়ে গেল বিন্দুর। ওর সহজ সরল মুখখানির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিশ্বরূপ বলল, 'বিন্দু, আমি যদি তোমাকে শাদি করতে চাই তোমার আপত্তি আছে?'

বিন্দু তখন স্থির হয়ে গেছে। ওর চোখ দুটো মুহূর্তের জন্য ছলছলিয়ে উঠল। বলল 'কিন্তু আমরা যে খুব গরিব বাবুজি, আমাদের কিছু নেই।'

বিশ্বরূপ বলল, 'এটা কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর হল না। তুমি রাজি কিনা বলো।'

বিন্দু ওর শাড়ির আঁচলটা গলায় দিয়ে প্রণাম করল বিশ্বরূপকে।

বিশ্বরূপ অবশ্য কথা রেখেছিল। ওর বাড়িতেও কেউ আপত্তি করেনি।

অনেক পরে বিন্দুর মুখে শুনেছিল অলকা বা অলকানন্দা অন্য কেউ নয়। পদ্মা-মা ও পণ্ডিতজির অবৈধ কন্যা। বাসুদেব ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সে ভালবাসার বন্ধনে জড়িয়ে পড়লেও ওর জন্ম পরিচয় জেনে বাসুদেব ওকে প্রত্যাখ্যান করে। তাই মনের দুঃখে ও অভিমানে আত্মহননের পথ বেছে নেয় অলকা। পক্ষকাল পরে এক দুর্যোগের রাতে বাসুদেবও মারা যায় গাছ চাপা পড়ে।

উচিতপুরের যাত্রী

বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ের অদূর বড়শূল নামে একটি গ্রাম আছে। সেখান থেকে নদী পার হয়ে ওপারে গেলেই বোরো গ্রাম। আজ থেকে আশি অথবা একশো বছর আগে এইসব গ্রামে যাতায়াতের যে কী অবস্থা ছিল তা এখনকার কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।

বৈঁচির পরেশ পাত্রর দিদির বিয়ে হয়েছিল মা বিষহরির থান উচিতপুরে। বোরোয় আছে বলরামের মন্দির। দিদির মুখে এখানকার বলরামের কাহিনি শুনে আপ্লুত হয়েছিল পরেশ। তাই ও ঠিক করেছিল বোরো গ্রামে বলরামকে দর্শন করে তবেই ও উচিতপুরে যাবে।

সেই মন করে বৈঁচি থেকে ট্রেনে যখন শক্তিগড়ে নামল তখন দুপুর গড়িয়েছে। সময়টা গ্রীষ্মকাল। তবু ছায়া সুনিবিড় ওই স্টেশন চত্বরে দহনজ্বালা নেই বললেই চলে। প্রকৃতি তখন সমস্ত ঋতুতেই সমান ভাবে তার ভারসাম্য বজায় রেখে চলত। এখনকার মতো এমন অ্যাবনর্ম্যাল ব্যাপার-স্যাপার হত না।

পরেশ স্টেশনে নেমে দেখল আঙুল গুণে দু'তিনজন ছাড়া আর কোনও যাত্রী নেই। বাকি যে দু'তিনজন আছে তারা রেলেরই লোক।

এ পথে এই প্রথম আসছে পরেশ। তাই একজন অল্পবয়সি রেল কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করল, 'বড়শূল গ্রামে কীভাবে যাওয়া যায় ভাই?'

এমন সময় পাশ থেকে কে যেন একজন বলল, 'বড়শূলে কাদের বাড়ি যাবেন আপনি?'

পরেশ বলল, 'কারও বাড়ি নয়। আমি যাব বোরো গ্রামে বলরাম দর্শন করতে।'

প্রশ্নটা যে করেছিল সেও প্রায় ওরই বয়সি। বলল, 'কিন্তু এখন তো একটু অসময় হয়ে গেল। তিনটে বাজলে এখানে খেয়া পারাপার বন্ধ হয়ে যায়।'

'তাহলে উপায়?'

'উপায় একটাই আছে। এই শক্তিগড়ে অথবা বড়শূলে কারও বাড়িতে এক রাত কাটিয়ে কাল সকালে খেয়া পর হয়ে বোরোয় যান।'

পরেশ বলল, 'কোনও দরকার নেই। তার চেয়ে ভাল আজকের রাতটুকু আমি এখানে স্টেশনেই থেকে যাই না কেন?'

'যা আপনার ইচ্ছা। আমার বাড়ি সম্পূর্ণ উল্টোদিকে। আমড়া গ্রামে। আমার নাম হীরু। আমার ওখানে গেলে আমি অবশ্য কাল সকালে আপনার জন্য একটা গোরুর গাড়ি ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

পরেশ বলল, 'অত সবের দরকার কি। আজকের রাতটা আমি এখানেই কাটিয়ে দিতে পারব।'

দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে গেল। সন্ধে হল। চারদিক থেকে শেয়ালের ডাক শোনা যেতে লাগল। তখন তো এত ঘন ঘন ট্রেন চলত না তাই মাঝে একটা মালগাড়ি যাওয়ার পর চারদিক স্তব্ধ হয়ে গেল।

স্টেশনে তখন ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা ছিল না। দু'একটি ল্যাম্পপোস্টের আলোতেই কাজ চলে যেত। তারই ক্ষীণ আলোয় মশার কামড় খেতে খেতে পরেশ অকারণে স্টেশনময় পায়চারি করতে লাগল।

একসময় সেই অল্পবয়সি রেলকর্মচারীটি এসে বলল, 'সারারাত আপনি এইভাবে স্টেশনে পায়চারি করবেন নাকি? ইচ্ছে করলে আমাদের স্টেশন মাস্টারের ঘরে চট পেতে শুয়ে পড়তে পারেন।'

পরেশ বলল, 'উনি আপত্তি করবেন না?'

'না। খুব ভালমানুষ উনি। বর্ধমানের পার—বীরহাটার লোক। হালে বদলি হয়ে এখানে এসেছেন।

'তবে তো ভালই হয়। কোনওরকমে রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল ভোরেই বিদায় নেব। বোরোর বলরাম দর্শন করে চলে যাব উচিতপুরে।'

ওদের এই সব আলোচনার সময়ই বর্ধমানের দিক থেকে একটা ট্রেন এল। কিছুক্ষণ থেমে ট্রেন চলে যাবার পর দেখা গেল শূন্য ঝাঁকা মাথায় নিয়ে বছর কুড়ির এক তরুণী ওদের দিকে আসছে। ময়লা শাড়ি পেঁচিয়ে পরা। মাজা কালো গায়ের রং। ওদের দু'জনকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'তোমরা দু'জনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কী করতাছ গো?'

কর্মচারী ছেলেটি বলল, 'এমনি গল্প করছি। তা সাবি, তুই এত দেরি করে ফিরলি কেন?'

'সদরঘাটে একজনের সঙ্গে কথা বলছেনু তাই আগের টেরেনটা ফেল হয়ে গেল।'

'তা বেশ বেশ। তুই একটা কাজ কর দিকিনি, এই দাদাটাকে তোর ওখানে নিয়ে যা। তোদের ঘরে-দাওয়ায়, যেখানে হোক একটু ঠাঁই করে দে। যা হোক কিছু খেতেও দিস। না হলে সারাটা রাত শুকিয়ে থাকবে বেচারি।'

সাবি বলল, 'তা না হয় দেব। কিন্তু উনি যাবেটা কোথায় শুনি?'

এবার পরেশ বলল, 'যাব উচিতপুরে। কাল ভোরে নদী পার হয়ে বোরোর বলরাম দর্শন করেই চলে যাব।'

'এসো তবে আমার সঙ্গে। বড়শূল হয়েই তো যেতে হবে। আমার বাড়ি বড়শূলেই।'

পরেশ যেন হাতের মুঠোয় স্বর্গ পেল। সাবির সঙ্গ নিয়ে অন্ধকার বনপথে ধরে ওদের গ্রামের দিকে চলতে লাগল।

যেতে যেতেই সাবি বলল, 'তুমি এই পেরথম এসতেছ বুঝি?'

পরেশ বলল, 'হ্যাঁ, এ পথে এই প্রথম।'

'বোরোয় আমাদের অনেক নোকজন আছে। ইচ্ছে করলে একটা দিন সেখানেও থেকে যেতে পারো। রাস্তা না চেনো, বললে ওদেরই কেউ তোমাকে উচিতপুরে পৌঁছে দেবে।'

এইভাবে কথা বলতে বলতে একসময় ওরা বড়শূল গ্রামে পৌঁছে গেল। গ্রামের পরিবেশ যে কেমন রাতের অন্ধকারে তার কিছুই ও বুঝতে পারল না। সে যাই হোক, সাবি ওকে ওদের প্রায় হেলে পড়া একটি বাড়িতে নিয়ে

এল। পাশাপাশি দুটি ঘর। উঠোন। বাঁশের খুঁটির ভরে খড়ের চালার দালান ও রোয়াক।

সাবি পরেশকে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই ওর বৃদ্ধা মা বললেন, 'তোর সন্নে ও কে র‍্যা সাবি?'

সাবি বলল, 'অতিথি। আজ রাত টুকুন এখানে কাটিয়ে কাল ভোরে বোরোয় যাবে।'

'অ। তা ওকে চাটাই পেতে বসতে দে মা।'

মা না বললেও সাবি এ ব্যাপারে খুবই তৎপর। দালানে মাদুর পেতে পরেশকে বসতে বলে বালতি ভরতি জল এনে উঠোনে রাখল। বলল, 'মুখ-হাত-পা ধুয়ে নেও গো দাদাবাবু। আমি ততক্ষণে তোমার খাবারের ব্যবস্থা করি।'

পরেশ মুখ-হাত-পা ধুয়ে নিতেই একটা আনকোরা নতুন গামছা ওর দিকে এগিয়ে দিল সাবি। পরেশের মন ভরে গেল এই সুন্দর আতিথেয়তায়।

এরপর দালানে বসে পোশাক পরিবর্তন করে একটু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

সাবি এবার একটা বড় জামবাটিতে চিঁড়ে মুড়ি ছাতু আর গুড় দিয়ে বলল, ঘটিতে জল আছে। এই মেখে খেয়ে নাও। আমি ততক্ষণে ভাত বসাই। বেশি দেরি হবে না। কেষ্টা ভাগ্যিস বলল তোমার কথা, না হলে সারারাত না খেয়েই থাকতে হত তোমাকে।'

পরেশ বলল, 'তুমি যা ব্যবস্থা করলে এই ঢের। আর ভাতের ব্যবস্থা না করলেও চলবে।'

সাবি বলল, 'ওমা! তা কী হয়? আমরা মা মেয়েও তো খাব।'

অতএব জলযোগ পর্ব শেষ করল পরেশ।

সাবিও কাঠকুটো জ্বেলে রান্নার ব্যবস্থা করতে লাগল।

ওদের উঠোনের ওপর ঝুঁকে পড়া একটি বড় তেঁতুলগাছের ডাল থেকে কর্কশ স্বরে প্যাঁচা ডেকে উঠল একটা। পরেশও গ্রামের ছেলে। তাই একটুও ভয় পেল না ও।

অনেক পরে গরম ভাত, ডাল, আলুভাতে ও পোস্তর বড়া এনে ওর সামনে ধরে দিল সাবি। বলল, 'এর বেশি আর কিছু নেই গো আমাদের ঘরে।'

পরেশ বলল, 'আর কিছু দরকারটাই বা কী? খুব আনন্দ পেলাম তোমাদের এখানে এসে।'

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে বাইরের দাওয়ায় একটা মাদুর পেতে মাথার বালিশ এনে পরেশের শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিল সাবি। মাথার কাছে ডিশ চাপা জলের একটা গেলাসও রাখল।

সারাদিনের ক্লান্তি ও ভরপেট খাওয়ার পর ফুরফুরে বাতাস গায়ে লাগতেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল পরেশ।

অনেক পরে ওর শরীরের ওপর দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে যেতেই ঘুমটা ভেঙে গেল ওর। একটি-দু'টি করে পাখির ডাকও শুনতে পেল ও। তার মানে ভোর হয়ে আসছে। ও যেখানে শুয়েছিল তার পাশ দিয়েই যাতায়াতের মেঠো পথ। কেমন যেন একটু শীতভাব লাগতেই উঠে বসল ও। এইসময় একটা চাদর পেলে বেশ হত। একথা মনে হতেই ঘরের ভেতর থেকে একটা ময়লা চাদর কে যেন ছুড়ে দিল ওর দিকে। ও সেটা গায়ে দিয়ে যেই না পাশ ফিরে শুতে যাবে অমনি কানে এল, 'বোরো যাবে তো উঠে পড়ো, রওনা হও এইবেলা।'

পরেশ সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। দেখল সাবি কোথাও যেন যাবার জন্য তৈরি হয়ে দাওয়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ও এক মুহূর্ত দেরি না করে সাবির পিছু নিল।

অনেক পরে আকাশ একটু ফরসা হতে শয্যা ত্যাগ করে চোখে-মুখে জল দিয়ে পরেশের জন্যও জল ও চা-বিস্কুট নিয়ে এল সাবি। কিন্তু কোথায় পরেশ? মাদুর-বালিশ সবই তো ঠিক আছে। শুধু মানুষটাই যা নেই। সাবি ভাবল ঘুম ভাঙার পর হয়তো প্রকৃতির দৃশ্য দেখবে বলে আশে-পাশেই কোথাও গেছে মানুষটা। না হলে যাবেই বা কোথায়? ফিরে আসবে এখনই।

এইভাবে প্রায় এক-দেড় ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও মানুষটা যখন ফিরল না সাবির তখন দুশ্চিন্তা হল খুব। কেননা তার কাঁধের ঝোলা ব্যাগ তো ওর জিম্মায় ভেতর ঘরে আছে। তা হলে? অতএব চলে নিশ্চয়ই যায়নি।

এইভাবে কেনই বা যাবে?

সাবিকে পথে নেমে এদিক-সেদিকে পায়চারি করতে দেখে প্রতিবেশী দু'একজন মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর কী হয়েছে র‍্যা? কেউ এসবে নাকি?'

সাবি তখন পরেশের কথা বলল।

শুনে সবাই অবাক, 'ওমা! এমন হয় নাকি?'

এমন সময় নদীর দিক থেকে দু'একজন মেয়ে-পুরুষ আসছিল। তারাও শুনল। শুনে বলল, 'এইমাত্র ঘাটে আমরা একজনকে দেখে এলাম। বেশ ভাল ঘরের ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। কথা বলছে না কারও সঙ্গে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে সবাইকে। কখনও হাসছে। কখনও কাঁদছে।'

সাবি বলল, 'ঠিক দেখেছ তোমরা?'

ওরা বলল, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। এই অঞ্চলের লোকই নয় ও।'

সাবি আর কোনও কথা না বলে ছুটে ঘরে গিয়ে পরেশের ব্যাগটা নিয়ে মাকে জানিয়ে গ্রামের দু'একজন মহিলার সঙ্গে নদীর ঘাটে এল। এসে দেখল সত্যিই এক রাতের অতিতি পরেশ বালুচরে উপুর হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চার-পাঁচজন লোকের তখন জটলাও হচ্ছে ওকে ঘিরে।

সাবি আর সকলের সাহায্য নিয়ে ওর চোখে-মুখে নদীর জলের ঝাপটা দিয়ে একটু প্রকৃতিস্থ করল। তারপর বলল, 'তুমি তো দিব্যি শুয়েছিলে দাওয়ায়। কিন্তু এখানে এলে কী করে?'

বেশ কিছুক্ষণ ওর কথার উত্তরই দিতে পারল না পরেশ। তারপর একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বলল, 'তুমিই তো আমাকে ডেকে নিয়ে এলে। তোমার সঙ্গে খানিক এসে আর তোমাকে দেখতে পেলাম না। হঠাৎই আমি হালকা হয়ে আকাশে উড়ে যেতে লাগলাম। নদীর কাছাকাছি আসতেই শুনতে পেলাম কে যেন একজন বেলবনের ভেতর থেকে হুংকার দিয়ে বলল, 'কাকে নিয়ে যাচ্ছিস রে তোরা? নামা বলছি, নামিয়ে দে।' ওরা কারা তা জানি না। তবে ওই মানুষটির ধমক না খেলে আমাকে ওরা কোথায় নিয়ে যেত কে জানে?'

সবাই তখন কার উদ্দেশে যেন করজোড়ে প্রণাম জানিয়ে বলল, 'তোমাকে নিশি ভূতে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। যাঁর হুকুমে ভয় পেয়ে ওরা নামিয়ে দিল তোমাকে তিনি হলেন এখানকার বেলবনের বড়বাবা। আমরা কেউ কখনও

চোখে দেখিনি তাঁকে। তবে সবাই খুব মান্যি করি। তাঁর কৃপাতেই এ যাত্রা বেঁচে গেলে তুমি।'

পরেশ নিজেও এবার দু'হাত জোড় করে প্রণাম জানাল বড়বাবাকে। এমন চমকপ্রদ ঘটনার কথা এর আগে আর কখনও শোনেনি পরেশ। ঘটনার কথা চাউর হতেই বোরো গ্রামেরও কয়েকজন এসে সাবির সঙ্গে ধরাধরি করে তাকে নিয়ে গেল বোরোতে। তারপর সে কী দারুণ আতিথেয়তা। সবাই বলল, 'আজ এই অবস্থায় বড়বাবার কৃপাধন্যকে কিছুতেই আমরা এ গ্রাম ছেড়ে যেতে দেব না। আমাদের গ্রাম্য দেবতা বলরামজির প্রসাদ পেয়ে আজকের সারাটা দিন-রাত্রি এখানে কাটিয়ে কাল ভোরে যাবে মা বিষহরির থানে।'

অতএব অনুরোধ রাখতেই হল। সাবিও রয়ে গেল ওর সঙ্গে। বলল, 'কাল সকালে আমি নিজে তোমাকে উচিতপুরে পৌঁছে দিয়ে তবেই ঘরে ফিরব।'

পরেশ অবশ্য এ ব্যাপারে কোনও আপত্তি করল না। সেদিনটা বলরামের প্রসাদ পেয়ে গ্রামবাসীদের সেবাযত্ন ও ভালবাসায় নন্দিত হয়ে দারুণ আনন্দে কাটাল। পাছে আবার নতুন করে নিশির কোনও উপদ্রব হয় সেই ভয়ে সারারাত জেগে সবাই পাহারা দিল পরেশকে।

পরদিন সকালে জলযোগ পর্ব শেষ হলে উচিতপুরে যাবার জন্য তৈরি হল পরেশ। এই গ্রামের অনেকেরই বউ-মেয়ে উচিতপুরের। তাই তারাও সঙ্গ নিল ওর। গ্রামের লোকেরাই দুটি গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করে দিল। এত সুখ অবশ্য আশা করেনি পরেশ। তাই মহানন্দে সবার সঙ্গে গো-যানে যাত্রা করল উচিতপুরের দিকে। সাবিও রইল সঙ্গে। তবে ওর চোখের দৃষ্টি উদাসী। বড় ভাল মেয়ে সাবি। সে রাতে ওদের ঘরে আশ্রয় না পেলে পরেশের জীবনে এমন দুর্লভ অভিজ্ঞতা কখনওই হত না।

বিদ্যাবতীপুরের কাজললতা

সেকি আজকের কথা! পালকি আর গোরুর গাড়িই ছিল তখন একমাত্র যান। সেইসময় হুগলি জেলার বিদ্যাবতীপুরে অত্যন্ত দরিদ্র কৃষক পরিবারে এমন এক মেয়ে জন্মাল যে জন্মলগ্নেই তার মাকে হারাল। বাধ্য হয়েই বাবা আবার সংসারি হলেন। সৎ-মায়ের কখনও আদর কখনও অনাদরে ধীরে ধীরে শশীকলার মতো বড় হতে লাগল মেয়েটি। মুখ-চোখ যেন তুলিতে আঁকা। কিন্তু গায়ের রংটি এত কালো যে সচরাচর এমনটি দেখা যায় না। তাই ওর নাম রাখা হল কাজললতা। সবাই ওকে কাজল বলেই ডাকত।

দেখতে দেখতে কাজল যখন চতুর্দশী হল তখন তার সুন্দর মুখখানির দিকে তাকালে মন ভরে যেত সকলের। কিন্তু তাও তার বিয়ের জন্য অনেক চেষ্টা করেও কোনও পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেল না।

এমন যখন অবস্থা তখন এক শুভদিনে কয়েকজন বৈষ্ণব তীর্থযাত্রী গ্রামে এসে উপস্থিত হল। এখানকার সুপ্রাচীন এক বটবৃক্ষের নীচে আশ্রয় নিল তারা। ঠিক সন্ধের মুখেই এসেছিল দলটি। সেখানেই ভিক্ষার সামগ্রী যা ছিল তাই দিয়ে কাঠকুটো জ্বেলে সেবার ব্যবস্থা করল। আর নাম-গানে মুখর করে তুলল চারদিক।

গ্রামবাসীরা যার যা সামর্থ্য তাই এনে নিবেদন করল বৈষ্ণবসেবার জন্য। দুধ, ঘি, ফল, মিষ্টি অনেক কিছুই। কাজলদের পরিবার থেকেও উপহার সামগ্রী কিছু এল। আর কাজল? যখনই সে জানতে পারল এই তীর্থযাত্রী দলটি যাবে বৃন্দাবন পরিদর্শনে তখনই সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল এই দলটির সঙ্গ

নিয়ে বৃন্দাবনে সে যাবেই। বৃন্দাবন ঘুরে সে নাম-গান করবে। মন্দিরের দ্বারে বসে ভিক্ষা করবে। নিজের জীবনটাই সে উৎসর্গ করবে কৃষ্ণপদকমলে।

এই বৈষ্ণব তীর্থযাত্রী দলে নারী-পুরুষ সবাই ছিল। কাজল তার মনোবেদনার কথা দলের মেয়েদের কাছে বলতেই তারাও রাজি হয়ে গেল কাজলকে ওদের দলে নিতে। অবশ্যই ওর বাবার সম্মতি থাকলে তবেই।

পরদিন খুব ভোর-ভোর রওনা। কাজল বরাবরের জন্য চলে যাবে শুনে বাবা প্রথমে 'না' করলেও পরে গ্রামবাসীদের কথা শুনে বাধ্য হয়েই রাজি হলেন। সঙ্গে আরও একজন জুটে গেল। সে হল মোহন। দশ-বারো বছরের বাপ-মা মরা ছেলে। মাঠে মাঠে গোরু চরায়। কাজলকে সে খুব ভালবাসত। দিদি দলে ডাকত। কাজল চলে যাবে শুনে কাঁদতে কাঁদতে সেও এসে ভিড়ে গেল দলে। বলল, 'দিদিরে, তুই চলে গেলে আমি আর বাঁচব নারে। আমিও যাব তোর সঙ্গে। আমার তো কেউ নেই। তাই আমি চলে গেলে কার কী? তুই আমাকেও সঙ্গে নে, দিদি। আমরা দু'ভাই-বোনে বৃন্দাবনে ভিক্ষে করে খাব। ওদের বল না দিদি, ওরা যেন আমাকেও নেয়।'

কাজল বৈষ্ণবদের কাছে মোহনের আকুতি জানাতে দলের যিনি প্রধান তিনি রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, 'ওর যখন পিছুটান নেই তার ওপর এত আগ্রহ তখন যাক না আমাদের সঙ্গে। প্রভুর কৃপা হলে ব্রজবাসী হয়ে সুখেই থাকবে তোমরা।'

অতএব বরাবরের জন্য জন্মভূমি বিদ্যাবতীপুর ত্যাগ করে বৈষ্ণব তীর্থযাত্রী দলের সঙ্গে রওনা হল কাজল ও মোহন।

গ্রাম ছেড়ে প্রথমে এল ওরা দশঘরায়। এখানকার জমিদার ছিলেন দেব-দ্বিজে অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ। তিনি ওই দলটিকে রথতলার চালাঘরে আশ্রয় দিয়ে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনিয়ে তাদের সেবার ব্যবস্থা করলেন।

বৈষ্ণবরা করজোড়ে বলল, 'জমিদারবাবু! আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। তবে কিনা আমরা নিজেরাই রেঁধে খাব। কেননা গলায় কণ্ঠি না থাকলে তাদের হাতে আমরা খাই না।'

জমিদারবাবু রাগ না করে সেই ব্যবস্থাই করে দিলেন। কাজল আর মোহন অবশ্য জমিদারগৃহেই ভোজন করল।

বৈষ্ণবদের এই তীর্থযাত্রী দল এক রাতের বেশি কোথাও থাকত না। তাই পরদিন সকাল হতেই বিদায় চাইল জমিদারবাবুর কাছে।

জমিদারগিন্নি বললেন, 'তা বাবারা, এখন বোশেখ মাস। গরমের দিন। রোদ্দুরও খুব চড়া। আপনারা দিনে বিশ্রাম নিয়ে রাতে যাত্রা করছেন না কেন?'

প্রধান বললেন, 'আমাদের মহন্ত মহারাজের নির্দেশ। তা ছাড়া বনপথ ধরে যাওয়া। পথে দস্যু-ঠ্যাঙাড়ের ভয়। তাই আমরা রাতে আশ্রয় নিয়ে দিনে পথ চলি। তা ছাড়া রাতে জন্তু-জানোয়ারের উপদ্রবও হতে পারে।'

অতএব আর কথা নয়। তীর্থযাত্রী দল আবার রওনা হল বৃন্দাবনের পথে।

এইভাবে বেশ কয়েকদিন যাবার পর ওরা এমন একজায়গায় এসে পড়ল সেখানে আসামাত্রই ভয়ংকর দুর্যোগের মুখোমুখি হল ওরা। এক গভীর বন-প্রদেশে যখন ওরা প্রবেশ করল তখন হঠাৎ করেই ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেল আকাশটা। তারপরই শুরু হল প্রচণ্ড কালবৈশাখী ঝড়। ঝড়ের বেগে কে যে কোথায় ছিটকে গেল তা বোঝাও গেল না। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে কে কোথায় আশ্রয় নিল তা কে জানে? এই বিধ্বংসী ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল সব। এরপরই শুরু হল বজ্রবিদ্যুৎ ও শিলাসহ প্রবল বর্ষণ। তখন সন্ধে হতে বেশি দেরি নেই। কাজল মোহনের একটা হাত শক্ত করে ধরে এক জায়গায় বড় দু'টি গাছের ফাঁকে বসে রইল চুপচাপ। শুধু বসে থাকা তো নয়, ভিজতেও লাগল।

অনেক পরে প্রকৃতি শান্ত হলে ওরা যখন আড়াল থেকে বেরিয়ে এল তখন দু'জনেই ভিজে সপসপ করছে। কিন্তু এসে যা দেখল তাতে দু'জনেরই জল এল চোখে। কাজল ও মোহন ছাড়া দলে মোট বারোজন ছিল। গাছ চাপা পড়ে ও শিলাবৃষ্টিতে সবাই তারা শেষ। প্রত্যেকের মৃতদেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে এদিক-সেদিক। আতঙ্কে ভয়ে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল ওদের। কাজলের মনে হল এইভাবে হঠাৎ করে ঝুঁকি নিয়ে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে না এলেই হত।

মোহন কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, 'কী হবে রে দিদি, এখন আমরা কী করে বৃন্দাবনে যাব?'

কাজল বলল, 'জানি না। পথ-ঘাট চিনি না। আমার খুব ভয় করছে রে।'

মোহন বলল, 'আমারও। এখন যদি কোনও বাঘ-ভালুক এসে যায়?'

কাজল বলল, 'আসতেই পারে। তাই মনে হয় এই জায়গা ছেড়ে এখনই চলে যাওয়া উচিত।'

মোহন বলল, 'তাই চল, দিদি। তবে আমার কী মনে হচ্ছে জানিস?'

'কী?'

'দলের সবাই মরে গেল অথচ আমরা বেঁচে রইলাম। তার মানে আমাদের আর কোনও বিপদ হবে না। আমরা একদিন না একদিন ঠিকই বৃন্দাবনে গিয়ে পৌঁছব। এখন চল, এগিয়ে গিয়ে দেখি কোথাও কোনও গ্রামের সন্ধান পাই কিনা। এই এতগুলো মরা লোকের পাশে আর থাকা নয়।'

কাজল এবার মোহনের একটা হাত ধরে সুমুখপানে এগিয়ে চলল। কিন্তু যাবেই বা কী করে? পথ কোথায়? চারদিকে গাছপালা উপড়ে পথ একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে আছে।

এমন সময় হঠাৎই চার-পাঁচজন গ্রাম্য লোক কোথা থেকে যেন এসে হাজির হল সেখানে। তারা অবাক চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওমা! তোমরা কারা গো? মা-ছেলেতে এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ?'

মোহন বলল, 'মা-ছেলে নই আমরা দু'ভাই-বোন। বৃন্দাবন যাচ্ছিলাম এমন সময় ঝড়-জলে আটকে গেছি। ওই দেখো আমাদের দলের সব লোক মরে গেছে।'

ওদেরই একজন বলল, 'আহা রে। ঠিক আছে, তোমরা আমাদের গ্রামে চলো। কোনও ভয় নেই তোমাদের।'

কাজল বলল, 'তোমাদের গ্রাম কতদূরে?'

'ও-ই যে দেখা যাচ্ছে।'

'কিচ্ছু তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'পাবে কী করে? যে হারে গাছপালা উপড়ে পড়েছে তাতেই তো সব আড়াল হয়ে গেছে। আমরা এখনই পথ করে দিচ্ছি তোমাদের।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই তারা সবাই মিলে হাতে হাত লাগিয়ে গাছপালা সরিয়ে পথ করে দিল।

মোহনের হাত ধরে ওদের নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলল কাজল। খানিক যাওয়ার পরই একটি গ্রাম নজরে এল ওদের। যাক, রাতটা তাহলে ভিজে পোশাকে বাইরে কাটাতে হবে না। আশ্রয় একটা পাবেই। শুধু দুঃখ এই যে অতগুলো মানুষ অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

যেতে যেতে মোহন চাপা গলায় বলল, 'দিদি, আমরা কোনও বদ লোকেদের পাল্লায় পড়লাম না তো?'

কাজল বলল, 'চু-উ-প। যদি পড়েই থাকি কিছু তো করার নেই। আর আমাদের কাছে টাকা-পয়সাও নেই কিছু যে কেড়ে নেবে। দেখাই যাক না কোথায় নিয়ে যায় ওরা।'

'আমার কিন্তু ভয় করছে খুব। ওই মোটা-সোটা গাছের ডাল, উপড়ে পড়া বড় গাছ নিমেষের মধ্যে কীভাবে সরিয়ে ফেলল ওরা দেখেছিস তো? এদের গায়ে কি অসুরের শক্তি ?'

একসময় গ্রামে পৌঁছল ওরা। গ্রামে লোক-বসতি আছে ভালই। মাটির ঘর। খড়ের চাল। অন্ধকারে সবকিছু স্পষ্ট না হলেও দেখে মনে হল বেশ শান্তির পরিবেশ।

ওদের দেখেই ঘোমটা টানা একজন বউ একটি ঘরের শিকল খুলে ভেতরে নিয়ে এল ওদের।

ওরা সেই ঘরে ঢুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল! কাজল ওর ব্যাগ থেকে শুকনো শাড়ি একটা বার করে পরে নিল। মোহনেরও আলাদা প্যান্ট-শার্ট-জামা ছিল ওর কাছে। সেটা ওকেও পরিয়ে দিল।

এরপরে যা হয়, অচেনা অতিথিদের দেখতে গ্রামের সবাই এসে ভিড় করল সেখানে। খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ওরাও দেখতে লাগল সেই ভিড়ের দৃশ্য।

গ্রামের যিনি মাতব্বর একসময় তিনি এসে ধমক-ধামক দিয়ে সরিয়ে দিলেন প্রত্যেককে।

একটু পরেই তিনজন গৃহবধূ এসে থালা ভরতি খাবার, কলসি ভরা জল রেখে গেল ওদের জন্য। সবারই মাথায় ঘোমটা এমনই ছিল যে কারও মুখ দেখা গেল না। যাবার সময় ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল ওরা।

মোহন বলল, 'এরা কেউ কথা বলে না কেন রে দিদি?'

কাজল বলল, 'কে জানে? হয়তো লজ্জা পায়।'

যাই হোক, প্রচণ্ড খিদের মুখে ওরা নানারকম উপাদেয় খাদ্য পেয়ে বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই খেয়ে নিল সব কিছু।

মোহন বলল, 'এই অজ গাঁয়ে এত সব ভাল ভাল খাবার, সন্দেশ রসগোল্লা কী করে পেল বল তো দিদি?'

'জানি না রে। যেখান থেকেই পাক আমাদের তা জানার দরকার নেই। এখন শুয়ে ঘুমিয়ে রাতটা কোনও রকমে কাটাই আয়, তারপর কাল সকালে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব।'

'বৃন্দাবনে যাবি না?'

'যাব তো। রাস্তা যখন চিনি না তখন সবাইকে জিগ্যেস করতে করতেই যাব। ভিক্ষে করব। যখন যা জুটবে তাই খাব। দিনের শেষে যেখানে যে গ্রাম চোখে পড়বে সেখানেই আশ্রয় নেব। তারপর বৃন্দাবনে পৌঁছলে গতি একটা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে আমাদের।'

এই ঘরে একটি তক্তাপোশে সুন্দর করে বিছানা পাতা ছিল। মোহনকে নিয়ে কাজল সেখানেই শুয়ে পড়ল শরীরের ক্লান্তি দূর করতে। একটু পরে মোহন ঘুমিয়ে পড়লে কাজলও নিদ্রা গেল অকাতরে।

রাত তখন কত কে জানে? হঠাৎই একটা কান্নার স্বর ও শুকনো পাতা মাড়িয়ে যাওয়ার শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল কাজলের। সারাটা দুপুর বিকেল ধরে অমন প্রবল বর্ষণের পর শুকনো পাতা মাড়িয়ে যাওয়ার শব্দ আসে কী করে? তা ছাড়া অমন করুণ স্বরে কাঁদেই বা কে? কাজলের গা-টা এবার ছমছমিয়ে উঠল। হঠাৎই ওর কানে এল কারা যেন শবদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে হরিধ্বনি দিয়ে। কান্নার সঙ্গে এবার শোনা যেতে লাগল নারী ও পুরুষের সমবেত কণ্ঠস্বরে বিলাপের ধ্বনি। কাজল বিছানা ছেড়ে উঠে বসল এবার। আবার হরিধ্বনি দিয়ে শুকনো পাতা মাড়িয়ে চলে গেল আর এক শববাহকের দল। তারপরে আবার...!

ততক্ষণে মোহনও উঠে পড়েছে। কাজলকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমার খুব ভয় করছে রে, দিদি।'

কাজল বলল, 'ভয় কী? আমি তো আছি।' তারপর ঠোঁটে তর্জনী রেখে ওকে চুপ করতে বলে পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা ফাঁক করতেই কেঁপে উঠল বুকের ভেতরটা। চোখের সামনে ও দেখতে পেল দলে দলে শব বাহকেরা লাইন দিয়ে মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা কেঁদে কেঁদে বিলাপ করছে। তাদের সবাই তাকিয়ে আছে কাজলের দিকে। শববাহকেরাও কেমন যেন চোখে দেখছে তাকে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ও ভয়ের ব্যাপার যেটা, তা হল খাটিয়ায় শায়িত শবেরাও পলকহীন দৃষ্টিতে ঘাড় উঁচু করে দেখছে কাজলকে। হাহাকার ও আর্তনাদে কান পাতা দায় হয়েছে তখন। ওইসব দেখে মোহন ভয়ে জ্ঞান হারাল। কাজলও মূর্ছা গেল আতঙ্কে ও ভয়ে।

অনেক পরে একটি স্নেহকোমল কণ্ঠের ডাকে সম্বিত ফিরে পেল কাজল। দেখল এক জ্যোতির্ময় পুরুষ ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আর ও মোহনকে আঁকড়ে ধরে একটা পোড়ো ভাঙা মাটির ঘরের দাওয়ায় পড়ে আছে।

রাতের আঁধার তখনও ভাল করে কাটেনি। এই স্যাঁতসেঁতে ভাঙা ঘরের মধ্যে ও কেমন করে এল তা ভেবেই পেল না। মোহনের গায়ে একবার হাত বুলিয়ে দেখল সে ঠিক আছে কিনা। কাজলের স্পর্শ পেয়ে মোহনও নড়ে-চড়ে উঠে বসল এবার। তবে শক্ত করে ধরে রইল কাজলকে।

কাজল অবাক চোখে সেই জ্যোতিষ্মানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'আপনি কে বাবা? আমি এখানে কী করে এলাম?'

মুণ্ডিতমস্তক দিব্যকান্তি সেই পুরুষ বললেন, 'তুই তো আসিসনি, তোকে নিয়ে আসা হয়েছে। সঙ্গের ওটি কে? তোর ছেলে বুঝি?'

'না। আমার ভাই।'

'দু'ভাইবোনে এই বনপথে কেন এলি? কে তুই? কোথা থেকে এসেছিস তোরা?'

কাজল তখন সব বলল।

সব শুনে জ্যোর্তিময় পুরুষ বললেন, 'আজ থেকে ঠিক দু'বছর আগে এক মহামারীতে এই গ্রামের সবাই মারা যায়। তাদের অশরীরী আত্মারা প্রায় রাতেই হাহাকার করে কেঁদে মরে। তবে ওরা কারও ক্ষতি করে না। ওরাই

তোদের দু'ভাইবোনকে নিয়ে এসেছে এখানে। সময়মতো আমি এসে না পড়লে আরও কিছুক্ষণ থাকত ওরা।'

কাজল বিনীত গলায় বলল, 'আপনি আমাদের রক্ষা করুন বাবা।'

'আমি তো সেইজন্যই এসেছি রে। আমি এখানেই এক জায়গায় ধ্যানে ছিলাম। তোদের বিপদ বুঝেই এসেছি। বৃন্দাবনের পথ তোরা তো চিনিস না। আমি তোদের নিয়ে যাব সেখানে। গোবিন্দজির কৃপা পাবি তোরা। কাল সকালের মধ্যেই বৃন্দাবনে পৌঁছে যাবি।'

'তা বাবা, যে বৈষ্ণবদলের সঙ্গে আমরা আসছিলাম তারাও তো বৃন্দাবনের যাত্রী। তাদের কেন অমন পরিণতি হল?'

জ্যোতিষ্মান পুরুষ বললেন, 'যাদের যেমন নিয়তি। তাকে রোধ করার হাত কারও নেই। তবে তোর দুঃখের জীবন শেষ। আজকের এই রাতের আঁধার কেটে গেলেই তোর দেহের কালোও মুছে যাবে। তোর রূপের ছটায় আলো হয়ে উঠবে চারদিক। বৃন্দাবনে আমার গুরু মাধবাচার্যের আশ্রমে থাকবি তোরা। সেখানেই এক বনেদি পরিবারের বউ হবি তুই। তোর ঘর হবে, সংসার হবে। আর এই বাপ-মা মরা ছেলেটা হবে তোর সর্বক্ষণের সঙ্গী। ব্রজবাসী হয়ে ও-ও খুব সুখে থাকবে। আমার গুরুর আশ্রমেই থাকবে ও।'

কাজল উঠে গিয়ে জ্যোতির্ময়ের চরণে প্রণাম করতে যেতেই তিনি পিছু হঠলেন। বললেন, 'দূরে থেকেই প্রণাম কর মা। আমি তোর প্রণাম নিলাম।'

কাজল বলল, 'তাহলে আপনি আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করুন।'

উনি হেসে বললেন, 'আশীর্বাদ করলাম। আর দেরি করিস না। আয় তোরা আমার সঙ্গে। আমি এখনই তোদের বৃন্দাবনে পৌঁছে দেব।'

'কিন্তু বাবা, সে তো বহুদূরের পথ।'

'আমার মায়া প্রভাবে এক লহমায় পৌঁছে যাবি তোরা সেখানে।'

কাজল মোহনের হাত ধরে সেই জ্যোতির্ময়কে অনুসরণ করল। উনি এক জায়গায় একটি নদীর ধারে এসে বললেন, 'চোখ দুটো বুজে থাক তোরা।'

কাজল আর মোহন তাই করল।

একটু পরেই উনি বললেন, 'এবার চোখ মেলে দেখ কোথায় এসেছিস?'

ওরা চোখ মেলেই দেখল এক মন্দিরময় স্থানে ওরা এসেছে। পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে।

কাজল বলল, 'এ কোথায় এলাম বাবা? এই কি বৃন্দাবন? এই কি সেই যমুনা?'

কিন্তু কোথায় সেই জ্যোতির্ময়! ধারে-কাছে কোথাও তো তিনি নেই। রাতের আঁধার মুছে তখন ভোর হয়ে গেছে। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। জ্যোতির্ময়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'এই সেই মধুবৃন্দাবন। এই সেই যমুনা নদী।'

'আমাকে তো দেখতে পাবি না মা। একটু পরেই আমার গুরুর আশ্রম থেকে যে আসবে তার সঙ্গেই চলে যাবি তোরা।'

কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল।

মোহন হঠাৎ দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠল আনন্দে। বলল, 'দিদিরে! এ কী হল তোর?'

কাজল বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'কী হল আমার?'

'তুই হঠাৎ এত ফরসা হয়ে গেলি কী করে?'

'কী বলছিস বোকার মতো?'

'নিজের মুখ তো আয়না ছাড়া দেখতে পাবি না। হাত-পাগুলো দেখ।'

কাজল এবার নিজের হাত-পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল রীতিমতো চম্পকবরণী হয়ে উঠেছে সে। বিস্ময়ে আনন্দে ওর চোখে জল এল।

এমন সময় দূর থেকে একজন আশ্রমিককে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল। ওরা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে।

আশ্রমিক দ্রুত পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'তোমরা এসে গেছ? আমাদের গুরুজি অপেক্ষা করছেন তোমাদের জন্য। এসো, আমার সঙ্গে এসো।'

কাজল ও মোহন অনুসরণ করল তাঁকে।

গুরুজির আশ্রমে স্থান হল ওদের। সব কিছুই যেন স্বপ্নময় মনে হল। শ্রীগুরুর কৃপায় কিছুদিনের মধ্যেই কাজল এক বনেদি পরিবারের বউ হল। আর মোহন? গুরুর আশ্রমেই ব্রজবাসী হয়ে রয়ে গেল সে।

আহিরণ রজনীতে

যে সময়কার কথা বলছি তখন চট করে কোথাও যাব বললেই যাওয়া যেত না। খুব কম করেও একশো বছর আগের কথা। ধূলিয়ান গঙ্গা থেকে পিসিমার গুরুতর অসুখের খবর পেয়ে মন চঞ্চল হয়ে উঠল বিনয়ের। এক বছর আগে বাবা গত হয়েছেন। মায়েরও শরীরের অবস্থা ভাল নয়। এই অবস্থায় অত দূর পথ কীভাবেই বা যাওয়া যায়? অথচ এমন একটা সংবাদ পেয়ে না গেলেও তো নয়।

চিঠিটা মাকে দেখাতে মা বললেন, 'আমার জন্য চিন্তা করিস না। আমি তো একেবারে শয্যাশায়ী নই। আমি ঠিক চালিয়ে নিতে পারব। তুই যা, পারলে কাউকে সঙ্গে নে। পিসিমা এ যাত্রা সামলে গেলে একেবারে ওখানকার পাট চুকিয়ে ওঁকে নিয়েই চলে আসবি।'

অতএব চটজলদি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্তরের ব্যাগ ঘুছিয়ে রবি নামে এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে রাতের প্যাসেঞ্জারে রওনা হল ওরা।

বিনয়দের পরিবার যে খুব একটা সচ্ছল তা নয়। বাবা সরকারি চাকরি করে সামান্য কিছু রেখেও গেছেন। বাবার পেনসন মা পান। বিনয় গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে আর এগোতে পারেনি। চাকরির চেষ্টা করছে যদিও, তবুও আশানুরূপ কিছু পায়নি। বয়সও একুশ পেরিয়ে বাইশ। সুন্দর সুঠাম দেহ। মা-ছেলের সংসারে ভালভাবেই দিন কাটায় ওরা।

সে সময় ট্রেনে এত ভিড়-ভাট্টা ছিল না। তাই ঘর থেকে নিয়ে আসা লুচি আলুর দম আর দু'টো করে সন্দেশ মুখে দিয়ে দু'জনে দু'টি বাঙ্ক দখল করে শুয়ে পড়ল।

এইভাবে সারাটা রাত কাটল। পরদিন সকাল হতেই কখনও চোখের সামনে গঙ্গা, কখনও বনময় প্রান্তরে প্রকৃতির রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল ওরা। এইভাবে সারাটা দিন দুপুর কাটানোর পর বিকেলের দিকে ট্রেন এসে পৌঁছল ধূলিয়ান গঙ্গায়।

ছোট স্টেশন। একপাশে একটি গুমটি ঘর। প্লাটফর্ম বলে কিছু নেই। রেলের দু'জন কর্মচারী ওদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে দেখে বিনয় গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'চন্দ্রবাবুর বাড়িটা কোনখানে বলতে পারেন?'

ওদের একজন বলল, 'কেন পারব না? উনি তো আমাদের রেলবাবু ছিলেন। চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি।'

এখন আর তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে কোনও ট্রেনের যাতায়াত নেই। তাই ওরা দু'জনেই বিনয় আর রবিকে নিয়ে চন্দ্রবাবুর গঙ্গার ধারের বাড়িতে পৌঁছে দিল। পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। তাই অসুবিধে হল না।

দরজা খোলাই ছিল। বিকেলের দিক বলেই বোধ হয় কয়েকজন মহিলা পিসিমার সঙ্গে গল্পে মেতেছিলেন। দেখে মনে হল পিসিমা এখন অনেক সুস্থ। ওরা দু'জনে গিয়ে প্রণাম করতেই পিসিমা আশীর্বাদ করে বললেন, 'তোরা যে আসবি তা ভাবতেও পারিনি। খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা হয়েছিল আমার। যাই হোক, এখন অনেকটা সামলে গেছি। তোর সঙ্গের ছেলেটি কে?'

'আমার বন্ধু রবি। একা আসব, তাই মা বললেন ওকে সঙ্গে নিতে। তা ছাড়া তোমার শারীরিক অবস্থা এখন ঠিক কীরকম তা তো জানি না। যদি তুমি শিবপুরের বাড়িতে ফিরে যাও আমাদের সঙ্গে তখন কিন্তু ওর সাহায্যের দরকার হতে পারে।'

পিসিমার কাছে আরও যারা ছিলেন বললেন, 'তোমাদের পিসেমশাই-ই যখন চলে গেলেন তখন আর একা উনি এইভাবে এখানে পড়ে থেকেই বা করবেন কী? তার চেয়ে আমরা বলি কি তোমরা ওঁকে নিয়েই যাও।'

পিসিমা বললেন, 'আমিও তেমনই ভাবছি। তবে কি জানো, আজ কতদিনের বাস এখানকার। ধূলিয়ানের ওপর একটা মায়া পড়ে গেছে। গঙ্গার তীরে এমন বাড়ি-বাগান। এখান থেকে বরাবরের জন্য চলে যেতে সত্যিই কি কারও মন চায়? তা ছাড়া তোমরা তো আছ সবাই। এই তো এমন একটা অসুখ থেকে

তোমরাই আমাকে বাঁচিয়ে তুললে। তা ছাড়া এখান থেকে চলে গেলে এই বাড়ি বাগান সব অন্যের দখলে চলে যাবে। আর এত দূরের রাস্তা, মাঝে মাঝে আমার ভাই-ভাইপো এসে যে দেখাশোনা করবে তাও সম্ভব নয়।'

কথাটা ঠিক। চলে আসব বললেই তো চলে আসা যায় না। তা সে পরে যা হয় তাই হবে। এখন যে পিসিমা অনেকটা সুস্থ। এতেই নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হল। সেঁজুতি নামে চতুর্দশী এক মেয়ে লাজুক লাজুক মুখ করে পিসিমার কাছে এসে বলল, 'ও বাড়ির কত্তা মা পাঠালেন। আপনার ভাইপোরা তো এসেছেন। এদের বিছানা-পত্তর কোন ঘরে কীভাবে হবে বলে দিন আমি সব ঠিক করে দেব। আর এনারা দু'জনে আজ রাতে কত্তামার ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করবেন। কাল থেকে রান্নার ব্যবস্থা এখানেই হবে।'

পিসিমা বিনয়কে বললেন, 'দেখলি তো কত সুখে আছি আমি। এত ভালবাসা যেখানে, সেখান থেকে কি সহসা চলে যাওয়া যায়?'

এরপর সেঁজুতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘর গুছিয়ে ওদের জন্য শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিল।

তারপর পিসিমা বললেন, 'যা, ওদিককার দোকান থেকে তোর পছন্দমতো কিছু ভাল ভাল মিষ্টি নিয়ে আয়। ততক্ষণ মিষ্টি খেয়ে একটু জল খাক ওরা। কতদূর থেকে এসেছে। সারাদিন ভালমতো পেটে কিছু পড়েওনি।' বলে কয়েকটা টাকা সেঁজুতির হাতে ধরিয়ে দিলেন।

এই অল্প দর্শনেই সেঁজুতির মুখ বিনয়ের মনের ক্যানভাসে আঁকা হয়ে গেছে। গায়ের রং যদিও চাপা তবু কী অপূর্ব তার মুখশ্রী। ধীর স্থির নম্র। দারুণ মিষ্টি মেয়ে।

বিনয় পিসিমাকে বলল, 'আমরাও বরং যাই ওর সঙ্গে। পথ-ঘাট একটু চিনে আসি। কাল থেকে আমরাই যেতে পারব দোকান বাজার করতে।'

পিসিমা বললেন, 'বেশ তো যা না।'

বিনয় রবিকে ইশারা করলে রবি বলল, 'আমি এখন আর বেরোচ্ছি না। তুই গিয়ে সব দেখে শুনে আয়। কাল সকাল থেকে যেখানে যেতে বলবি সেখানে যাব। এখন ঘুমে দু'চোখ লুটিয়ে আসছে আমার।'

অতএব পোশাক পরিবর্তন করে মুখ-হাত-পা ধুয়ে রবি একতলাতেই ওদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে হালকা একটা চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল।

বিনয় এমনিতেই ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে খুব। তার ওপর এই নতুন জায়গায় সেঁজুতির মতো দারুণ এক মিষ্টি মেয়ের সান্নিধ্য পেয়ে যেন বর্তে গেল।

পথে যেতে যেতে সেঁজুতি বলল, 'তুমি এর আগে কখনও আসনি এখানে?'

'না। খুব ছোটবেলায় একবার এসেছিলাম। তার কিছুই আমার মনে নেই। বড় বয়সে এই প্রথম।'

'তোমার কোনও বোন-টোন নেই? থাকলে তাকেও আনতে পারতে।'

'উঁহু। আমিই আমার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান।'

'আমিও। আমার কোনও ভাই বা দাদা নেই। বোনও নেই। কাল যদি তুমি ভোর ভোর উঠতে পারো তাহলে আমি তোমাকে গঙ্গার ধার থেকে ঘুরিয়ে আনব। কালীমন্দির দেখাব।'

বিনয় বলল, 'আমি তো এমনই চাই। দু'চার দিনের জন্যে এসেছি। সব কিছু ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখে শুনে যাব। এখন তো রাস্তা চিনে গেছি। সাহস হয়েছে। মাঝে মাঝে সময় পেলেই চলে আসব।'

'তোমার ওই বন্ধুটা যেন কিরকম।'

'আসলে ঘোরার উৎসাহ সবার থাকে না। ওকে সঙ্গে এনেছি একা আসব না বলে। তারপর পিসিমার যদি কিছু হয়ে যায় তখন আমি সামলাতে পারব না তাই। আর উনি যদি সঙ্গে যেতে চান তখনও ওকে দরকার হতে পারে।'

এইভাবে কথা বলতে বলতে ওরা বেশ কিছুক্ষণ ধূলিয়ানের গ্রাম্য পরিবেশে ঘুরে বেড়াল। তারপর স্টেশন এলাকারই একটি দোকান থেকে কিছু উপাদেয় মিষ্টি কিনে ঘরে ফিরল সন্ধের আগেই।

এরপর ঘুম থেকে রবিকে ডেকে তুলে সেঁজুতির সাহায্য নিয়ে পিসিমা মিষ্টিমুখ করালেন।

এখানে তখনও ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা হয়নি। তাই চিমনি লণ্ঠনের আলোরই ব্যবস্থা ছিল সর্বত্র।

সেঁজুতি পাকা হাতে সে ব্যবস্থাও করে দিয়ে বলল, 'এবার তাহলে আমি আসি? তোমরা তৈরি থেকো। কত্তা-মা ডাক দিলেই আমি এসে নিয়ে যাব তোমাদের।'

বিনয় বলল, 'পিসিমা কী খাবেন তাহলে?'

'উনি তো খই-দুধ খান।'

সেঁজুতি চলে গেলে পিসিমাকে বলল বিনয়, 'বেশ মেয়েটি। কাদের মেয়ে?'

'আর বলিস না। তোর পিসেমশাই বুড়ো বয়সে হঠাৎই শখ করে আহিরণে গঙ্গার ধারে তিন হাজার টাকায় ছোট্ট একটা পুরনো দোতলা বাড়ি কেনে, ওই বাড়ির কাছাকাছি সেঁজুতিরা থাকে। তা সেঁজুতির বাবা-মা-ই ওই বাড়ির দেখা শোনা করে। মাসে ওদের পাঁচ টাকা করে দিই আমরা। খুবই গরিব ওরা। ওদেরও একটা নিজস্ব মাথা গোঁজার ঠাঁই আছে। সেখানেই থাকে ওরা। তা তোর পিসেমশাই মারা যাওয়ার পর আমি সেঁজুতিকে আমার এখানে নিয়ে আসি কিছুদিনের জন্য। সেই থেকে ও রয়েই গেছে এখানে। ও বাড়ির কত্তা মা-ও ওকে খুব ভালবাসেন। বলতে গেলে ও দু'বাড়িতেই থাকে এখন। আমার অসুখের সময় খুব করেছে ও।'

'ওর বাবা-মা নিয়ে যেতে চান না?'

'ও যেতে চায় না। বলে এখানেই বেশ আছি। ওর মা-বাবাও বলে সুখেই আছে মেয়েটা। এখানে থাকলে আর যাই হোক দুবেলা পেট ভরে খেতে তো পারে। তা ছাড়া দিব্যি হাসিখুশি ফুটফুটে মেয়ে। ডাগরও হয়েছে। ভাবছি তেমন একটি সুপাত্র পেলে সবাই মিলে বিয়েও দেব ওর।'

'সেটা যদি করতে পারো, তার চেয়ে ভাল কাজ আর হবে না। কিন্তু পিসিমা, আহিরণে তোমরা যে বাড়ি কিনেছিলে সেকথা আগে কখনও শুনিনি তো?'

'সে কী! জানতিস না?'

'না।'

'আসলে ওই বাড়ির প্রতি আমার কোনও টান বা মায়া নেই। ওই বাড়ি কেনার কিছুদিন পরেই মারা যান তোর পিসেমশাই। তখনই সেঁজুতিকে নিয়ে আমি চলে আসি এখানে। সেই থেকে আর যাইনি ওখানে।'

বিনয় কপালে হাত রেখে বলল, 'মাই গড! সেই থেকে ওই বাড়িটা

পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে? কোনও ভাড়াটেকেও তো বসিয়ে দিতে পারতে।'

'ওসব ঝক্কি কে পোয়াবে বল? সেঁজুতির বাবাকে বলেছি কেউ যদি নিতে চায় তো যে দামে কেনা সেই দামেই দিয়ে দেব বাড়িটা।'

বিনয় বলল, 'সে বরং ভাল। তবে কোনও কিছু করার আগে ওই বাড়িটা আমি একবার দেখতে চাই। তোমার এখন শরীরটা ভাল, তাই ভাবছি কালকের দিনটা থেকে পরশু সকালেই চলে যাই আহিরণে। ইতিমধ্যে তুমি একটু গোছ-গাছ করে রেখো। আহিরণ থেকে এখানে এসেই তোমাকে আমাদের ওখানে নিয়ে যাব আমি।'

পিসিমা বললেন, 'না রে। এই বাড়ির মায়া ছেড়ে আমি কোথাও যাচ্ছি না। আহিরণ থেকে ঘুরে আয়। তারপর ধূলিয়ানে দু'চারদিন থেকে বন্ধুকে নিয়ে বাড়ি চলে যা। এখন আমি সুস্থ। তাই বেশ আছি এখন।'

অতএব আহিরণে পিসিমার বাড়ি দেখার আনন্দে মেতে রইল বিনয়! রবিকেও বলল সে কথা। ও-ও উৎসাহ দেখাল। দু'বন্ধুতে অনেক গল্প হল ওই বাড়ির ব্যাপার নিয়ে। বাড়িটাকে কীভাবে রক্ষা করা যায় অথবা বেঁচে দেওয়া যায় সে ব্যাপারে আলোচনা হল।

রাতে সেঁজুতি এসেও দের নিয়ে গেল পাশের বাড়িতে। কী আদর যত্ন পেল ওরা। কথায় কথায় আহিরণ প্রসঙ্গেও হল। ওই বাড়ি দেখতে যাচ্ছি শুনে বাড়ির গৃহিণী অর্থাৎ কত্তা মা বললেন, যাও দেখে এস। তবে কি জানো বাবা, ও বাড়ি বিক্রি হওয়া মুশকিল। কেউ নেবে না। তার কারণ বাড়িটা গঙ্গার ধার ঘেঁষে এমনই জায়গায় যেখানে আর দু'তিন বছরের মধ্যেই হয়তো ভাঙনে ধ্বসে গঙ্গার গর্ভে চলে যাবে। তা ছাড়া বাড়িটা বোধ হয় অভিশপ্ত। ওই বাড়ি যাঁর ছিল তিনি অকালেই চলে গেলেন। আবার তোমার পিশেমশাই ও বাড়ি কেনার পরই মারা গেলেন। তা তোমরা যদি দু'বন্ধুতে যাও তো সেঁজুতিকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাও। দু'একদিনের ব্যাপার তো, তোমার পিসিমাকে আমরা দেখব। মেয়েটাও অনেকদিন ওদের গ্রামে যায়নি। এই সুযোগে ওর বাবা-মাকেও দেখে আসবে। তোমাদেরকেও পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবে।'

বিনয় বলল, 'অতি উত্তম প্রস্তাব। আমাদেরকে তাহলে কারও কাছে কোনও খোঁজখবর নিতে হবে না। পথ চিনিয়ে সেঁজুতিই নিয়ে যাবে।'

এরপর রাতের খাওয়া সেরে দু'জনেই ঘরে এসে শয্যাগ্রহণ করল। আহিরণের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়েও পড়ল একসময়।

পরদিন খুব ভোরে সেঁজুতি এসে ডেকে তুলল বিনয়কে। বলল, 'গঙ্গার ধারে নিয়ে যাব বলেছিলাম না? যদি যাও তো চলো। কালীমন্দিরটাও দেখিয়ে আনব।'

বিনয় সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করে রবিরও ঘুমও ভাঙাল। ও একবার উঠে বসে বলল, 'এখনও তো ভাল করে সকাল হয়নি রে। অন্ধকার রয়েছে।'

'তাতে কী?'

'আমি যাচ্ছি না। তুই যা। আমি আর একটু ঘুমিয়ে নিই।'

অগত্যা পিসিমাকে বলে সেঁজুতির সঙ্গ নিয়ে বিনয় চলল গঙ্গাতীরে।

কী দারুণ বনময় স্থান। সেঁজুতির হাতে সাজি ছিল। সে চারদিক থেকে নানা জাতের ফুল তুলে সাজি ভরতে লাগল। গঙ্গা তো বেশি দূরে নয়, কাছেই। সেখানে কিছুক্ষণ পায়চারি করে এবার এল কালীমন্দিরে। অন্ধকার দূর হয়ে একটু একটু করে আলো ফুটছে তখন।

সেঁজুতি মন্দিরের ভেতরে বিগ্রহ সেবার জন্য ফুল দিতে গেলে এক দিব্যদর্শন ব্রাহ্মণ, হয়তো দেবীর পূজারি এসে বললেন, 'তোমাকে এখানে নতুন দেখছি। কাদের বাড়ির গো?'

পরিচয় দিল বিনয়।

উনি বললেন, 'বুঝেছি। খুব ভালমানুষ ছিলেন। ওঁর স্ত্রীও ভাল। একটি গরিবের মেয়েকে কীভাবে পালন করছেন তা দেখছি তো। মেয়েটিরও ধর্মে মতি খুব। বড়ই সুলক্ষণা।' বলে গঙ্গার দিকে এগিয়ে গেলেন।

বিনয় প্রণাম করেত গেলে একটু পিছিয়ে গেলেন। বললেন, 'থাক, বাবা থাক।'

কেন কে জানে ওই ব্রাহ্মণকে দেখে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে এল। যেমন সুন্দর মুখশ্রী, তেমনই গায়ের রং।

সেঁজুতির পুষ্প প্রদান শেষ হলে ও বিনয়কে বলল, 'দর্শন করেছ?'

'না গো। এতক্ষণ ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম। কী ভাল মানুষ উনি। ঠিক যেন দেবতা।'

সেঁজুতি বলল, 'ঠাকুরমশাই! ঠাকুরমশাই তো মন্দিরের ভেতরে। তুমি যাঁকে দেখেছ উনি ঠাকুরমশাই নন। হয়তো অন্য কেউ।'

বিনয় মন্দিরে দর্শন করে সেঁজুতির সঙ্গে আবার পিসিমার বাড়ির দিকে চলল।

যেতে যেতেই সেঁজুতি বলল, 'কী ঠিক করলে? কাল তাহলে যাবে আমাদের আহিরণে?'

'নিশ্চয়ই যাব। আমার পিসেমশাই কেমন বাড়ি রেখে গেছেন সেটা একবার নিজের চোখে দেখতে হবে তো। আসলে পিসেমশাইয়ের বাড়ি মানেই আমার বাড়ি।'

'আমি তোমাকে ওখানকার অনেক কিছু ঘুরিয়ে দেখাব। তবে তুমি কি পারবে ওই বাড়িতে একা থাকতে?'

'একা কেন, আমার বন্ধুও থাকবে।'

'যদি যায় তবেই না। ধূলিয়ানের এমন সুন্দর পরিবেশেও ওর কোনও কিছু দেখার আগ্রহ নেই। একেবারেই বেরসিক।'

সেঁজুতির কথাই ঠিক হল।

ঘরে ফিরতেই রবি বলল, 'আমি আজই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছিরে বিনয়।'

এমনটা আশা করেনি বিনয়। বলল, 'কেন? হঠাৎ করে কী হল তোর?'

'আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখ।'

কপালে হাত দিয়েই বোঝা গেল জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে ওর।

বিনয় বলল, 'রাতারাতি এমন জ্বর বাঁধালি কী করে?'

'জানি না। কাল থেকেই আমার শরীরটা খারাপ করছিল। তোকে বলিনি। কাজেই এই জ্বর নিয়ে কোথাও কি যাওয়া ঠিক? তুই যা ঘুরে আয়। আমি বরং দুপুরের ট্রেনে বাড়ি ফিরে যাই। তা ছাড়া একটা কথা বলব, কিছু যেন মনে করিস না। তোদের ওই বাড়িটা মনে হচ্ছে অভিশপ্ত বাড়ি। ওই বাড়ির মালিক অকালে মারা গেলেন। তোর পিসেমশাইও বাড়ি কেনার পরই দেহ রাখলেন।

আমরা দু'বন্ধুতে যাব ঠিক করলাম, হঠাৎই জ্বরে পড়লাম আমি। তাই বলি ভাই ওই বাড়ির মায়া ত্যাগ কর।'

বিনয় কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। ও যা বলছে তা তো ঠিকই। ওর কথার সত্যিই যুক্তি আছে।

রবি আবার বলল, 'তুই যা। তবে একটা কথা, ওই বাড়িতে তুই রাত্রিবাস করিস না। পারলে সেঁজুতিদের ওখানে অথবা অন্য কোথাও থেকে যাস। আমিও তোর পাশে থাকলে হয়তো অন্যরকম পরিকল্পনা করতাম। কিন্তু আমার যা অবস্থা তাতে আজই আমার বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত।'

বিনয় বলল, 'না। এই অবস্থায় তোর এখানে থাকা ঠিক নয়। দুপুরের ট্রেনেই চলে যা তুই।'

এরপর সেঁজুতির প্রযত্নে মুড়ি তেলেভাজা সহ চা-পর্ব শেষ করল ওরা। বেলায় হালকা কিছু খাবার খেয়ে দুপুরের ট্রেনেই বিদায় নিল রবি। ওর জন্য বিনয়ের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

বিকেলের দিকে বিনয় একা একাই ঘুরে বেড়াতে লাগল সর্বত্র। এখানকার গঙ্গাতীরের মনোরম সৌন্দর্য অভিভূত করল ওকে। সত্যি, এই জায়গা ছেড়ে কি কোথাও যাওয়া যায়? পিসিমাও তাই এখানকার মাটি কামড়ে পড়ে আছেন।

নির্জন গঙ্গার তীরে সূর্যাস্তের পরও বিনয় যখন তন্ময় হয়ে বসে আছে তখনই ওর কানে এল, 'আর এখানে বেশিক্ষণ থেকো না। এবার ঘরে যাও।'

বিনয় পিছু ফিরে তাকিয়েই দেখল সেই দেবদ্যুতি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ। তাঁর প্রশান্ত মুখমণ্ডল থেকে মধুর হাসি ঝরে পড়ছে। বলল, 'আপনি এখানে?'

'আমি সন্ধ্যার সময় এখানে বসে একটু জপ-তপ করি। সন্ধের পর এখানে কিছু অনিষ্টকারী জীবজন্তুর আবির্ভাব হয়। অতএব সেই সময়টা এখানে না থাকাই ভাল।'

বিনয় প্রণাম করবে বলে ওঁর দিকে এগিয়ে যেতেই ব্রাহ্মণ বললেন, 'থাক বাবা থাক। এখন আমি অহ্নিকের পোশাকে আছি। দূর থেকেই প্রণাম করো তুমি।'

বিনয় দূর থেকেই প্রণাম করল ব্রাহ্মণকে।

ব্রাহ্মণ বললেন, 'আর কতদিন আছ এখানে?'

'বড় জোর দু'চারদিন, কাল একবার আহিরণে যাব। এক-দু'দিন থেকে ফিরে এসেই আবার স্বস্থানে।'

ব্রাহ্মণ মৃদু হেসে বললেন, 'এখন তোমার সুদিন আসছে। হঠাৎ করেই তোমার ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে এমনভাবে যে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। ঈশ্বরে মতি রেখো। ধূলিয়ানকে ভুলো না।'

বিনয় অভিভূত হয়ে বলল, 'আপনি আশীর্বাদ করুন। আমার যেন ভালই হয়।'

'ভাল হবে বলেই তো বললাম। এবার তাহলে এসো।'

বিনয় ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ফিরে এল পিসিমার ঘরে।

সেঁজুতি তখন ছট-ফট করছে ওর জন্য। বলল, 'কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ করে কোথায় চলে গেলে? সবাই আমরা হানটান করছি তোমার জন্য। কখন থেকে চা নিয়ে বসে আছি। চা খাও। কাল সকাল আটটার ট্রেনে যেতে হবে কিন্তু। আমাদের সঙ্গে বলাইদা নামে একজন যাবে। তোমার রাতের খাবার আমি এসে দিয়ে যাব।'

সেঁজুতি চলে গেলে বিনয় পিসিমার সঙ্গে গল্পে মাতল। তবে ওই ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হওয়ার ব্যাপারে কিছুই বলল না।

যথাসময়ে সেঁজুতি এসে লুচি, আলুর দম, দু-তিন রকম মিষ্টি বিনয়ের হাতে ধরে দিয়ে বলল, 'এবার খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো। বেশি রাত কোরো না। কাল সকাল সকাল যেতে হবে কিন্তু।'

সেঁজুতি চলে গেলে পিসিমা বললেন, 'কী ভাল মেয়ে রে। ঠিক যেন লক্ষ্মী প্রতিমাটি। যার ঘর আলো করবে তার সুখের অবধি থাকবে না।'

খাওয়া শেষ করে রবির কথা ভাবতে ভাবতে শয্যা গ্রহণ করল বিনয়। তারপর এপাশ ওপাশ করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

পরদিন খুব ভোরে হরেকরকম পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল বিনয়ের। তাড়াতাড়ি উঠে মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিতে সেঁজুতি এসে চা-বিস্কুট দিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে বিনয় ওর প্রয়োজনীয় যা কিছু তা গুছিয়ে নিয়েছে।

এমন সময় বলাইদা নামে একজন এসে পিসিমাকে প্রণাম করে বলল, 'কেমন আছেন পিসিমা? খুব শরীর খারাপ হয়েছিল শুনলাম। ভাল আছেন তো?'

'হ্যাঁ বাবা। ভালই আছি। তুমি তো অনেকদিন পরে এলে।'

বলাইদা বলল, 'সেঁজুতি জানে না। হঠাৎই ওর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। তাই ওর বাবা-মা আমাকে পাঠালেন ওকে নিয়ে যাবার জন্য। এসে শুনলাম আপনার ভাইপোকে আহিরণের বাড়ি দেখাতে নিয়ে যাবার জন্য ও আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে।'

পিসিমা বললেন, 'যাক, এতদিনে একটা গতি হল মেয়েটার। যার ঘরে যাবে ও তার ঘর আলো করে দেবে। তা তুমি কখন এলে?

'আমি এসেছি কাল ঠিক সন্ধের মুখে। ভালই হল, এখন আমিই ওদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারব।' বলেই বলল, 'এবার তাহলে আপনার আশীর্বাদ নিয়ে রওনা হওয়া যাক। দিন ঠিক হলে আপনিও যাবেন।' তারপর বিনয়কে বলল, 'আপনি রেডি তো? আসুন তাহলে আমার সঙ্গে। সেঁজুতি আগেই চলে গেছে স্টেশনে, টিকিট কাটতে। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।'

বিনয় পিসিমাকে প্রণাম করে বলাইদার সঙ্গে রওনা হল। সামান্য হাঁটা পথ। তাই অল্পসময়েই পৌঁছে গেল স্টেশনে।

একটু পরে ট্রেন এলে উঠে বসল সবাই। একেবারে ফাঁকা ট্রেন। জানলার ধারে দুটো সাইড সিট দেখে বিনয় ও বলাইদা বসল। সেঁজুতি বসল অন্যদিকে। বলাইদা একবার আড়চোখে সেঁজুতিকে দেখে চাপা গলায় বিনয়কে বলল, 'বিয়ের ব্যাপারটা ও কিন্তু জানে না।'

বিনয়ও ইঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দিল, বলব না।

একটু পরেই ট্রেন ছাড়ল। মাঝে তিন-চারটে স্টেশন। তাই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে গেল আহিরণে। স্টেশনের নাম আহিরণ হল্ট।

সেঁজুতিকে নিয়ে যাবার জন্য ওর বাবা আগে থেকে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বিনয়কে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'ইনি?'

বলাইদা বলল, 'ধূলিয়ানের পিসিমার ভাইপো। গঙ্গাধারের ওই বাড়িটা দেখতে এসেছেন।'

সেঁজুতির বাবার নাম ভোলানাথ। সবাই ওঁকে ভোলাদা বলেই ডাকে। উনি বিনয়কে দেখে শশব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওরে বাবাঃ। তা কী সৌভাগ্য আমার। আগে থেকে খবর পেলে আমি একটু ঝাঁট-পাট দিয়ে রাখতাম। এমনিতেই সব ঠিকঠাক আছে। বলাই গিয়ে ঝেড়েমুছে দেবে সব। তা পিসিমাকেও তো আনতে পারতে।'

বিনয় বলল, 'ওঁর শরীর তো ভাল নয়। শরীর খারাপের খবর শুনেই দেখতে এসেছিলাম পিসিমাকে। এখানে এসে শুনলাম আহিরণে গঙ্গার ধারে পিসেমশাই নাকি একটা বাড়ি করেছিলেন। তা সেই বাড়ি দেখার জন্যই আপনার মেয়েকে নিয়ে এখানে আসব ঠিক করেছিলাম। ইতিমধ্যে বলাইদা গিয়ে হাজির।'

ভোলাবাবু বললেন, 'এসো বাবাজীবন, আগে আমার ঘরে গিয়ে একটু পায়ের ধুলো দাও; তারপর তোমার বাড়িতে যাবে। আসলে ব্যাপার কী জানো বাবা, এখানে কোনও চোর-ডাকাতের ভয় নেই। কেউ যে বাড়ি দখল করে নেবে সে ভয়ও নেই। তাই যেমনকার বাড়ি তেমনই আছে। আমি সপ্তাহে একবার করে গিয়ে ঝাড়মোছ করি।'

এইভাবে কথা বলতে বলতে বিনয়কে নিয়ে পিসেমশাইয়ের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন ভোলাবাবু ও বলাইদা।

ভোলাবাবু বললেন, 'আমি তো চাবি নিয়ে আসিনি। তাই আমাদের বাড়িতেই একটু গিয়ে পায়ের ধুলো দিতে হবে। বলাই এখুনি তোমার সব ঘর পরিষ্কার করে থাকার ব্যবস্থা করে দেবে। আর সেঁজুতি—। সেঁজুতি কোথায় গেল?'

বলাইদা বলল, 'ও আমাদের আগেই ঘরে পৌঁছে গেছে। কতদিন পরে আসছে। ওরও মন তো ছটফট করছে মায়ের জন্য।'

বিনয় বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল ছোট্ট দু'কামরার দোতলা বাড়ি। ঘরের পিছনেই গঙ্গা। আর চারদিকে অজস্র গাছপালা ও সবুজের সমারোহ। বিনয়ের মন আনন্দে নন্দিত হয়ে উঠল।

ওরা যখন বাড়ি দেখে ফিরছে তখনই দেখা গেল চাবির গোছা হাতে নিয়ে সেঁজুতি ছুটে ছুটে আসছে।

এসেই বলল, 'না না, আমাদের ওখানে নয়। বাড়ির মালিক তার নিজের

বাড়িতেই উঠুক।' বলেই তালা খুলে বিনয়কে বলল, 'এসো। ওপরের ঘরেই চলো, ওখান থেকে সারাদিন-রাত ধরে গঙ্গা দেখবে। এখনই তোমার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি। বলাইদা, একটু হাত লাগাও তো।'

ব্যস। নিমেষে ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ভোলাবাবু বললেন, 'সত্যি, কপালগুণে মেয়ে পেয়েছিলাম একটা। ও হচ্ছে আমার ঘরের লক্ষ্মী।'

সবার সঙ্গে বাড়ির ভেতরে ঢুকে দোতলায় উঠেই বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গেল বিনয়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, এ বাড়ি কোনও মতেই হস্তান্তর হতে দেওয়া যাবে না। প্রতি মাসে একবার করে আসবে ও। মাকেও নিয়ে আসবে। মা এলেই পিসিমাও আসবেন। এই বাড়ি হবে ওর সুখের স্বর্গ। বলাইদা ততক্ষণে পাশের কুয়ো থেকে জল এনে বিনয়ের মুখ-হাত ধোওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

বিনয় সেই জলেই মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল। তারপর ওরা চলে গেলে ওপরের ঘরে গিয়ে পোশাক পরিবর্তন করে বাইরে এল চারদিকের প্রকৃতির মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্য। ছোট্ট জনপদ আহিরণ যে ওর মনকে এমনভাবে জয় করবে তা ও স্বপ্নেও ভাবেনি।

ঘর থেকে বেরিয়ে সবে দু'একপা এগিয়েছে ওমনি বলাইদার গলা শোনা গেল, 'এখনই কোথায় যাচ্ছেন গো দাদাভাই? আপনার জন্য জলখাবারের ব্যবস্থা হয়েছে। সেঁজুতি নিয়ে আসছে এখনই। খেয়ে যান।'

অতএব অনুরোধ রাখতেই হল। এখন এক দু'দিনের জন্য এসে গ্রামের মানুষ ওরা তো ওকে বাইরে খেতে দেবে না। তাই আবার ঘরে এসে বিছানায় বসে জানলার ফাঁক দিয়ে গঙ্গার সৌন্দর্য দেখতে লাগল।

একটু পরেই সেঁজুতি এল ডিশ ভরতি খাবার নিয়ে। লুচি, হালুয়া, দু'তিন রকমের উপাদেয় মিষ্টি। বলাইদা একটা মাটির কলসি ভরে জলও নিয়ে এল। এ বাড়িতে থালা-বাটি-ঘটি-গেলাসের অভাব নেই। সেখান থেকেই একটা গেলাসও নিয়ে এল জলধোয়া করে।

বলাইদা চলে গেলে সেঁজুতি একটু চাপা গলায় বলল, 'শুনেছ তো আমার ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ শুনেছি। তুমি খুব ভাল মেয়ে। তোমার ভাল হবে। খুব সুখী হবে তুমি। আমার আশীর্বাদ রইল তোমার প্রতি।'

'তুমিও খুব ভাল। যে তোমার ঘরণী হবে সেও খুব সুখী হবে। তবে পিসিমার জন্য আমার মন কেমন করবে খুব। তা যে জন্য বলছি শোনো, এখন থেকে তুমি নিজে নিজেই ঘুরবে এখানে। আজ-কাল দু'দিন নিশ্চয়ই আছ। গ্রাম ঘরের ব্যাপার। তোমার সঙ্গে টো টো ঘুরতে দেখলে—।'

'ব্যস। আর বলতে হবে না। উচিতও হবে না সেটা। তবে তোমার বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হলে কাউকে দিয়ে চিঠি লিখে জানিয়ো। পারলে আমার মা পিসিমাকেও নিয়ে আসব তোমার বিয়েতে। থাকার জায়গা তো আছেই আমাদের।'

বিনয়ের খাওয়া শেষ হলে ডিশ হাতে বিদায় নিল সেঁজুতি।

এরপর গঙ্গার তীর ধরে বহুদূর পর্যন্ত গিয়ে একটা শিবমন্দির, কালীমন্দিরও দেখে ঘরে ফিরল। ওর খুব ইচ্ছে হল গঙ্গায় স্নান করবার। তাই স্নানের জন্য তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরোতেই বলাইদা এসে বলল, 'একী! কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

'গঙ্গায় স্নান করতে। কতদিন যে গঙ্গায় স্নান করিনি। এখন ঘরের কাছে গঙ্গা ফেলে অন্য কোথাও কি যেতে মন চায়?'

'তাহলে চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাই। না হলে এই নির্জনে একা আপনাকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।'

বিনয় বলল,'ভালই তো। তুমি সঙ্গে থাকলে আমিও মনে একটু সাহস পাব।'

অতএব বলাইদাকে নিয়েই বিনয় তৃপ্তির সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করল। তারপর ঘরে এসে পোশাক পরিবর্তন করতেই বলাইদা বলল, 'এবার চলুন, ও বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার পাটটা চুকিয়ে নেবেন।'

ও বাড়ি মানে সেঁজুতিদের বাড়ি। বহুদিনের পুরনো একতলা বাড়ি। তা হোক, খুবই সুখের সংসার ওদের। সেঁজুতির বাবা-মা খুব যত্ন করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। তারপর ভাত-ডাল থেকে শুরু করে মাছ, মাছের মুড়ো, চাটনি, দই কত কী খাওয়ালেন।

সেঁজুতির মা বললেন, 'তুমি এসেছ বাবা, আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে। তোমার পিসিমা পিসেমশাইয়ের মুখে তোমার কথা শুনেছি। তা বাবা বিয়ের চিঠি পেলে এসো কিন্তু। মাকে, পিসিমাকেও নিয়ে আসবে। তোমরা ওপরের ঘরে থাকবে, আর নীচের ঘর দুটো ক'দিনের জন্য আমরা ব্যবহার করব।'

বিনয় বলল, 'বেশ তো। আমাদের দিক থেকে কোনও আপত্তি নেই। সারা বছরই যখন ইচ্ছে যেমন ভাবে ইচ্ছে ব্যবহার করবেন আপনারা। আমরা তো বারোমাস থাকব না। মাঝেমধ্যে আসব। তাই বাড়ি আপনাদেরই।'

বিনয়ের কথায় খুব খুশি হলেন ওঁরা।

আহার পর্ব সমাধা করে বিনয়ও ঘরে চলে এল।

বলাইদা বলল, 'রাতের খাবার আমি পৌঁছে দিয়ে আসব। ঘরে আলোর ব্যবস্থাও করে দেব একটু পরে। এর মধ্যে বাইরে কোথাও গেলে দরজা খোলা রাখবেন।'

ঘরে এসে আরামের শয্যায় শুয়ে বিনয় কত কী ভাবতে লাগল। ধূলিয়ানের চেয়েও এই জায়গাটা ওর মনে ধরল খুব। এই বাড়িটাকে সারা জীবন যখের ধনের মতো আগলে রাখবে ও। শুধু তাই নয়, এখনও সময় পেলেই চলে আসবে এখানে। এ তো ওর নিজেরই বাড়ি।

বেশ কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে একসময় উঠে পড়ল। তারপর বাইরে বেরনোর জন্য তৈরি হয়ে নীচের দরজা খোলা রেখেই চলে এল গঙ্গার ধারে। চারদিকেই এখানে বনময় প্রান্তর। সেই প্রান্তরে অনেকটা সময় ঘোরাফেরা করে যখন বাড়ির দিকে অর্ধপথে, তখনই কানে এল, 'সন্ধে হয়ে আসছে ঘরে যা। এই নির্জনে একা একা বেশি না ঘোরাই ভাল।'

কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল বিনয়। এ তো ধূলিয়ানের সেই ব্রাহ্মণের গলা। বলল, 'আপনি কোথায়?'

উত্তর এল, 'আমি সর্বত্র বিরাজমান। তুই এখন ঘরে যা।'

'আমি একবার আপনাকে দেখতে চাই।'

আর কোনও সাড়া শব্দই পাওয়া গেল না কোনও দিক থেকে। এমনকী সেই ব্রাহ্মণকেও দেখা গেল না।

বিনয় তখন একটু যেন ভয় পেয়ে দ্রুত পা চালিয়ে ঘরের দিকে গেল। ওর ভয়ের একটাই কারণ, কে ওই ব্রাহ্মণ? উনি কি তবে অশরীরী?

ঘরে এসেই দেখল বলাইদা আগে-ভাগেই সব ঘরে আলোর ব্যবস্থা করে রেখেছে। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেই স্থির হয়ে গেল। দেখল এক আশ্চর্য রূপবতী সারা শরীরে সৌগন্ধ বিলিয়ে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে নতবদনে একপাশে সরে দাঁড়াল। বিনয়ও একটু সরে যেতেই ওর পাশ কাটিয়ে নীচে নেমে গেল ও।

বিনয়ের তখন হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাবার জোগাড়। ওর ঘরে কে এই মেয়ে? এত রূপ কি সত্যিই কারও হতে পারে? মেয়েটি কোথা থেকেই বা এল? ওর ঘরেই বা কী করছিল সে? তা ভেবেই গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। গলায় জোর এনে বলাইদাকে ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারল না। ঘরে ঢুকে দেখল বিছানার চাদরটা এলোমেলো। অর্থাৎ মেয়েটি নির্ঘাৎ শুয়েছিল ওর ঘরে। এই অবস্থায় ও যে কী করবে কিছু ভেবে পেল না।

ওই অদৃশ্যের কণ্ঠস্বর, এই চমকপ্রদা রূপসী, সবই ওর কাছে মনে হল অলৌকিক। অনেক পরে একটু দম নিয়ে ডাক দিল, 'বলাইদা, বলাইদা! তুমি এসেছ?'

বলাইদারও কোনও সাড়া নেই।

বিনয় তখন ঘেমে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে ওর বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করছে কিন্তু নীচে নামার মতো সাহসটুকুও তখন হারিয়ে ফেলেছে ও।

এমন সময় নীচের দরজাটা ঠেলে খোলার শব্দ কানে এল ওর।

তারপরই সিঁড়িতে পদশব্দ।

আতঙ্কের চোখ নিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল বিনয়। এবার কী দৃশ্য দেখবে তা কে জানে? কিন্তু যা দেখল তা বিস্ময়কর। দেখল ডিশ ভরতি খাবার নিয়ে খুশিতে ঝলমলিয়ে ঘরে এল সেঁজুতি। বলল, 'বউ কেমন দেখলে বলো?'

'বউ! কার বউ?'

'কেন, তোমার?'

বিনয় হেসে বলল, 'বিয়েটা তোমার। এখানে আমার বউ কোত্থেকে আসবে? তা ছাড়া আমার তো বিয়েই হয়নি।'

সেঁজুতি বলল, 'আগে শ্বশুরবাড়ির মিষ্টি খাও, তারপরে বুঝবে বিয়েটা কার। তুমি যখন গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলে তখনই বলাইদা আর আমি এসে ঘরে আলো জ্বেলে চমক দেব বলে তোমার বউকে এখানে রেখে গেছি। বলাইদা আজ রাতের গাড়িতেই কলকাতায় যাচ্ছে তোমার মাকে আনতে। একটু পরে তোমার পিসিমাকে নিয়ে আমার মা-ও আসছেন।'

বিনয় স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সেঁজুতির মুখের দিকে চেয়ে।

সেঁজুতি বলল, 'খাও।'

বিনয় একটু একটু করে খেতে লাগল।

সেঁজুতি বলল, 'তুমি ততক্ষণ খাও। আমি নীচে গিয়ে দেখি ওদের আসতে দেরি হচ্ছে কেন।'

সেঁজুতি সিঁড়ি বেয়ে নামতেই দরজার কাছে যাঁর আবির্ভাব হল তাঁকে দেখেই চমকে উঠল বিনয়। ইনি তো ধূলিয়ানের সেই ব্রাহ্মণ। এখানে এলেন কী করে? বললেন, 'বলেছিলাম না তোর ভাগ্যোদয় হবে। জাঙ্গিপুরের গোস্বামী বাড়ির মেয়ে। আমি ওকে অত্যন্ত স্নেহ করি। খুবই শুদ্ধাচারী মেয়ে ও। আর পাঁচদিন পরে জাঙ্গিপুরে ওর বিয়ে ঠিক হয়েছিল। বিয়েটা কায়দা করে আমিই ভেঙে দিলাম। কেন না আমার তোকে খুব পছন্দ। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী ওরা। তোর কোনও অভাব থাকবে না। একমাত্র মেয়ে।'

'সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু বাবা আপনি কে?'

ব্রাহ্মণ হাসলেন। জবাব না দিয়েই ঘরের বাইরে মিলিয়ে গেলেন।

একটু পরেই পিসিমা এলেন সেঁজুতির মায়ের হাত ধরে। সেঁজুতিও এল সঙ্গে।

পিসিমা ঘরে এসেই বিনয়কে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তোর কী ভাগ্যরে বিনু, আজ সকালে জাঙ্গিপুর থেকে ওখানকার বিখ্যাত জমিদার ব্রজকিশোর গোস্বামী তাঁর বউ-মেয়েকে নিয়ে ধূলিয়ানে আমার ওখানে এসে হাজির। উনি একটি আদেশ পেয়েছেন ওঁর একমাত্র মেয়ে মালতীকে তোর হাতে তুলে দেবার।'

'কিন্তু উনি তো আমাকে চিনতেন না। দেখেনওনি কখনও।'

'আমিও তো চিনতাম না। তবে নাম শুনেছিলাম।

এমন সময় সেঁজুতির বাবার সঙ্গে সস্ত্রীক ব্রজকিশোর গোস্বামী এসে হাজির হলেন। বললেন, 'তুমি বাবা দ্বিমত কোরো না। আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ের সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল আজিমগঞ্জেই। হঠাৎই খুব ভোরে মঙ্গলারতির সময় এক জ্যোতির্ময় পুরুষ আমাকে দেখা দিয়ে বললেন, তোর মেয়ের বিয়ে ওখানে দিস না। ওই ছেলের অকালমৃত্যু যোগ আছে। তোর মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র আমি ঠিক করে রেখেছি। পাত্র সন্নিকটেই আছে।' বলে এখানে আসার নির্দেশ দিলেন। আমি ওঁকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই কোথায় যেন মিলিয়ে গেলেন উনি।'

বিনয় বলল, 'ওই জ্যোতির্ময় পুরুষের দর্শন আমিও পেয়েছি। উনি আমাকেও বলেছেন—।'

'কী বলেছেন উনি?'

বিনয় হেসে বলল, 'তিনি যা বলেছেন তা আমার অন্তরেই থাক। পিসিমা রাজি থাকলে এ বিয়েতে আমার আপত্তি নেই। মেয়েটিকে এক ঝলক দেখেওছি আমি।'

পিসিমা বললেন, 'আপত্তি থাকলে কি এক কথায় এখান পর্যন্ত ছুটে আসতাম? গোস্বামী বাড়ির লক্ষ্মীপ্রতিমা তোকে বরণ করতে আসছে এ দৈবকৃপা ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে? আজ রাতেই বলাই যাচ্ছে তোর মাকে আনতে। মা এলে নির্দিষ্ট দিনেই শুভকাজ সম্পন্ন হবে। তারপর সেঁজুতির বিয়ে দেখে তবেই আমরা এখান থেকে যাব। আমাকে তোরা নিতে এসেছিলি, আমি না বলেছিলাম। এখন বউ নিয়ে যাব আমি।'

এরপরে আর কোনও কথা নয়। আহিরণের এই রাত মুহূর্তে শঙ্খমুখর হয়ে উঠল। শঙ্খধ্বনি করল অবশ্য সেঁজুতিই। ওর আনন্দ যেন সবার চেয়ে বেশি।

যুবচন্দ্রিমাতে

এ কাহিনি আজকের নয়। প্রায় একশো বছর আগেকার। হুগলি জেলার বৈদ্যপুর রথতলার কাছে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস ছিল। মাত্র দু'কাঠা নিষ্কর জমি ও দেড় কাঠার বাস্তুই ছিল তাদের সম্বল।

এই পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ও একটি মাত্র ছেলে ছাড়া আর কেউ ছিল না। ছেলেটি ছিল যেমনই রূপবান তেমনই মিষ্ট স্বভাবের। নাম রাধাকান্ত। বাবা-মা ছেলের রূপ দেখেই বোধহয় এমন নাম রেখেছিলেন। সত্যই সার্থকনামা।

রাধাকান্তর ছিল দেব-দ্বিজে দারুণ ভক্তি । এগারো বছর বয়সে ওর পৈতে হলে তখন থেকেই ও নানা বিগ্রহের সেবাপূজা করত। এই গ্রামেই ছিল রাখালরাজার মন্দির। মন্দিরে সে দু'বেলা যেত। গান গাইত, প্রসাদ পেত। তবে লেখাপড়া সে খুব বেশি করেনি। গ্রামের পাঠশালাতেই যতটুকু যা হয়েছিল।

ওর বয়স যখন কুড়ি তখন বৈশাখ মাসের ভরদুপুরে এক সৌম্যকান্তি প্রবীণ ব্রাহ্মণ ওদের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। বললেন, আজকের দিনটা এ বাড়ির আশ্রয়ে থেকে কাল ভোরেই রওনা দেবেন বর্ধমানের দিকে।

অতিথির আগমনে সবাই খুব খুশি। পরিচয় জানতে চাইলে বললেন, তিনি আসছেন পাশের গ্রাম থেকে। বিবাহ করেননি। তার ওপর স্বজনহীন। তিনি বর্ধমানের রাজদরবারে যাচ্ছেন যদি সেখানে কোনও কাজকর্ম হয় সেই আশায়।

ব্রাহ্মণ সেদিনটা রয়ে গেলেন। রাধাকান্তর বাবা-মা সাধ্যমতো চেষ্টা করলেন ব্রাহ্মণ-সেবার। রাধাকান্তও সারাটা দুপুর-বিকেল ছায়ার মতো লেগে রইল অতিথি ব্রাহ্মণের সঙ্গে।

পরদিন সকালে ব্রাহ্মণ বিদায় নেবার আগে রাধাকান্তর বাবা-মাকে বললেন, 'আপনাদের ছেলের কপালে আমি একটি রেখা দেখতে পাচ্ছি। যুবচন্দ্রিমা যোগ না এলে এমন রেখা ফোটে না। খুব শীঘ্রই ও প্রচুর ধনরত্ন লাভ করে মস্ত ধনী হবে। কীভাবে হবে তা আমি বলতে পারব না। কেননা আমি জ্যোতিষী নই। তবে এই রেখাটি আমি চিনি বলেই এ কথা বললাম।'

ব্রাহ্মণের কথায় খুব আনন্দ হল রাধাকান্তর বাবা-মায়ের। ছেলের ভাগ্যোদয় হবে, বিত্তবান হবে এ কথা শুনলে কোন বাবা-মায়ের না আনন্দ হয়?

ব্রাহ্মণ রাধাকান্তর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আমার কথা মিথ্যে হবে না দেখে নিও।' বলে বিদায় নিলেন তিনি।

ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়ে রাধাকান্ত তখনই রাখালরাজার মন্দিরে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল। প্রার্থনা করল, 'ঠাকুর, আমি রাজাধিরাজ হতে চাই নয় তুমি শুধু আমাদের অভাব-অনটন দূর করো। তাহলেই আমি ধন্য হব।'

এরপর দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে যায়। হঠাৎ আবার একদিন সেই ব্রাহ্মণের চরণধূলি পড়ল ওদের বাড়িতে। রাধাকান্তর বাবা-মা এবারও অতিথিসেবার কোনওরকম ত্রুটি রাখলেন না।

পরদিন বিদায় নেবার সময় ব্রাহ্মণ বললেন, 'এতদিনে সময় হয়েছে। রাধাকান্তর শুধু যুবচন্দ্রিমা নয় মধুচন্দ্রিমাযোগও দেখা যাচ্ছে। আর মাত্র এক পক্ষকাল বাকি। দৈবকৃপায় রাজরাজেশ্বর হতে চলেছে ও।'

রাধাকান্তর বাবা ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে বললেন, 'আপনার আশীর্বাদ থাকলে ও নিশ্চয়ই সুখী হবে। তা আপনি বর্ধমান থেকে ফিরে এলেন কেন? সেখানে কি কোনও সুরাহা হল না আপনার?'

'হয়েছিল। কিন্তু অত বৈভবে আমার মন টিকল না। তাই আবার স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছি। আপনার ছেলের ব্যাপারেও ওখানে আমি কথা বলেছি। ওখানকার রাধামাধবের নিত্যপূজার জন্য এমন একজন সর্বাঙ্গসুন্দর যুবকেরই প্রত্যাশায় আছে ওরা। যত শীঘ্র সম্ভব রাধাকান্তকে পাঠিয়ে দিন বর্ধমানে। ওখানে গিয়ে আমার পরিচয় দিলেই বিগ্রহ সেবার কাজে বহাল হয়ে যাবে ও। আমার নাম রামসুন্দর ভট্টাচার্য।'

ব্রাহ্মণের কথামতো এক সুন্দর সকালে রাখালরাজার চরণে মাথা ছুঁইয়ে রাধাকান্ত রওনা হল বর্ধমানের পথে।

যে সময়কার কথা বলছি তখন ওই অঞ্চলে ছিল গভীর বন। স্থানে স্থানে ছিল ডাকাতদের আস্তানা। বর্ধমানও বহু দূরের পথ। মানুষ তখন দূরের যাত্রায় গেলে দিনে হেঁটে রাতে কোনও গ্রামে কারও বাড়িতে আশ্রয় নিত।

রাধাকান্তও তাই প্রথম রাত একটি গ্রামে এক গোয়ালার বাড়িতে কাটাল। তখনকার দিনে প্রায় সব মানুষেরই দেব-দ্বিজে দারুণ ভক্তি ছিল। তার ওপর অমন সুদর্শন উপবীতধারী রাধাকান্তকে দেখে গোয়ালা ভেবে নিল স্বয়ং ভগবানই বুঝি কৃপা করে আশ্রয় নিয়েছেন তার গৃহে। তাই পরম সমাদরে অতিথি সেবার সবরকম ব্যবস্থা করল। একুশ বছরের যুবক রাধাকান্ত অভিভূত হল গোয়ালার শ্রদ্ধা-ভক্তিতে। সেই মুহূর্তে রাধাকান্তর মনে হল, সত্যি জীবন কত সুন্দর।

সকাল হতেই শুরু হল আবার পথ চলা। গভীর বনের ভেতর দিয়ে পথ। মানুষজন, গবাদি পশু কোনও কিছুরই দেখা নেই। সঠিক পথে চলছে কিনা তা-ও বুঝতে পারল না রাধাকান্ত। এমন তো হবার কথা নয়। হাঁটতে হাঁটতে দুপুর গড়াল। একসময় ও এসে উপস্থিত হল মস্ত এক দিঘির পাড়ে। এতক্ষণে বুকে বল এল ওর। দিঘি যখন আছে তখন কোনও না কোনও গ্রামের দেখা নিশ্চয়ই মিলবে এবার। ও তাই পরম নিশ্চিন্তে দিঘির জলে স্নান করে গোয়ালার দেওয়া ক্ষীর-ননী খেয়ে খিদে মেটাল। তারপর একটি বড়সড় গাছের নীচে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল।

সবে একটু তন্দ্রা মতন এসেছে এমন সময় দেখল বলিষ্ঠ চেহারার চারজন লোক পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল ওর কাছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে লাঠি।

ওদেরই একজন জিগ্যেস করল, 'কে বাছা তুমি এখানে এইভাবে শুয়ে আছ?'

রাধাকান্ত বলল, 'তোমরা আমাকে চিনবে না। আমি বৈদ্যপুর থেকে আসছি। বর্ধমান রাজবাড়িতে চলেছি মন্দিরে কাজের আশায়।'

'তুমি তাহলে বামুনের ছেলে। দেখে তো মনে হচ্ছে কোনও মহাপুরুষ তুমি। তা যাক, আমাদের মুণ্ডমালিনী মায়ের অসীম কৃপা আজ এই শুভদিনে তোমাকে পাওয়া গেছে। এসো তুমি আমাদের সঙ্গে।'

ওদের চেহারা এবং কথাবার্তার ধরন শুনে ভয়ে বুক কেঁপে উঠল রাধাকান্তর। ও যে ডাকাতদলের হাতে পড়েছে তা বুঝতে আর বাকি রইল না। তবু বলল, 'কোথায় যাব আমি? আমার যে রাতের মতো একটু আশ্রয় চাই।'

'আশ্রয় দেব বলেই তো তোমাকে আমরা মায়ের মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছি।'

আর একজন বলল, 'মা যে এইভাবে তাঁর বলি জোগাড় করে দেবেন তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। জয় মা।'

রাধাকান্ত এবার মৃত্যুভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। স্নেহময়ী মায়ের মুখ, বাবার মুখ, অন্যান্য প্রিয়জনদের মুখ বারবার ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। মনে পড়ল সেই ব্রাহ্মণের কথা। তাঁর কথা শুনেই তো ওর এই অশুভ যাত্রা। যুবচন্দ্রিমা যোগ, মধুচন্দ্রিমা যোগ সবই কি তাহলে তাঁর মনগড়া ভবিষ্যদ্বাণী?

ডাকাতদেরই একজন বলল, 'আয় তুই আমাদের সঙ্গে। তোকে সর্দারের কাছে নিয়ে যাই।'

প্রাণভয়ে ভীত রাধাকান্ত বলল, 'না। আমি কোথাও যাব না। এই গাছতলাতেই পড়ে থাকব আমি।'

ডাকাতটা বলল, 'যেতে তোকে হবেই। মুখের কথায় না গেলে জোর করে তুলে নিয়ে যাব। তোর বিধিলিপি যে এই। আজ রাতেই তোর মরণ। মা'র চরণে তোকে বলি দিলে পরজন্মে তুই রাজাধিরাজ হবি।'

রাধাকান্ত আর কিছুই বলার অবকাশ পেল না। ওরা ওর হাত ধরে জোর করে টানতে টানতে নিয়ে চলল ওদের সর্দারের কাছে।

তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়েছে। অন্ধকার বনভূমিতে জ্বলছে মশালের আলো। একটি বৃহৎ বটগাছের নীচে এক ভয়ংকর দেবীমূর্তির সামনে রাধাকান্তকে নিয়ে এল ডাকাতরা। বলল, 'নিশারাগড়ের এই মা মুণ্ডমালিনীর গলায় যে খুলিগুলো দেখছিস এগুলো তোরই মতো ভাগ্যবানদের। আজ মধ্যরাত্রি থেকে তোর মুণ্ডুটাও শোভা পাবে দেবীর গলায়।'

একটু পরেই বিশাল শরীরের এক দানব এসে সামনে দাঁড়ালে ডাকাতরা

বলল, 'দৈবীকৃপায় আজ এক সর্বসুলক্ষণযুক্ত মানুষ বলির জন্য পেয়ে গেছি সর্দার।'

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সর্দার বললে, 'তা তো পেয়েছিস। কিন্তু আজ তো অমাবস্যা নয়। আজ প্রতিপদ।'

সঙ্গে সঙ্গে আশপাশ থেকে অপ্রাকৃত গলায় কারা যেন বলে উঠল, 'তাতে কী? তাতে কী? বলি দে।'

সেই কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল সবাই।

সর্দার বলল, 'কারা বলল একথা?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, 'এর আগে যাদের তোরা বলি দিয়েছিস আমরা তাদেরই অতৃপ্ত আত্মা। মা মুণ্ডমালিনীকে আমরা পাহারা দিই।'

কেউ কোনও দুরভিসন্ধি নিয়ে কিছু বলছে কিনা তা জানার জন্য সর্দারের নির্দেশে কয়েকজন মশালধারী ও লাঠিয়াল আশপাশের বন-জঙ্গল বেশ ভালভাবে ঘুরে দেখে এল। কিন্তু না, কারওরই দেখা মিলল না কোথাও।

সর্দার বলল, 'মায়ের নির্দেশেই তাঁর অনুচরেরা একথা বলেছে। মা তাহলে আমার প্রতি প্রসন্ন। জয় মা।' তারপর রাধাকান্তকে জিগ্যেস করল, 'কী নাম তোর?'

কাঁদতে কাঁদতে নিজের নাম বলল রাধাকান্ত।

সর্দার বলল, 'ব্রাহ্মণ সন্তান। এই প্রথম আমি ব্রহ্মহত্যা করব। আজ রাতে রায়রায়ানের হাত থেকে তোর নিস্তার নেই।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি হতে লাগল, 'আজই তোর শেষ রাত...আজই তোর শেষ রাত...আজই তোর...'

সর্দার গর্জে উঠল, 'কার কণ্ঠস্বর? কে? কে তুমি?'

নানা স্বরে উত্তর ভেসে এল, 'কে তুমি? কে তুমি? কে তুমি?'

রাগে ফেটে পড়ল সর্দার। বলল, 'যেই হও না কেন, যদি সাহস থাকে তো আমার সামনে এসে দাঁড়াও। রায়রায়ানের হাত থেকে এই বলি রক্ষা করার ক্ষমতা কারও নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে হা-হা করা হাসিতে ভরে গেল চারদিক। তারপরই নেপথ্য থেকে এক জলদগম্ভীর স্বর ভেসে এল, 'ওকে রক্ষা আমি করব।'

সেই কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় বুক কেঁপে উঠল সর্দারের। সে তার দলের লোকেদের দিকে তাকিয়ে বুঝল তারাও খুব ভয় পেয়েছে। আর রাধাকান্ত? সে এবার বাঁচার আশা দেখতে পেয়ে দু'হাত জোড় করে বলতে লাগল, 'কে তুমি তা জানি না। তুমি আমার জীবন রক্ষা করো। আমি রাজ-ঐশ্বর্য চাই না। আমি শুধু আমার মা-বাবার কাছে ফিরে যেতে চাই।'

দস্যুসর্দার মনে মনে ভয় পেলেও বাইরে কিন্তু তা প্রকাশ করল না। চিৎকার করে বলল, 'আমি মা মুণ্ডমালিনীর উপাসক। ঘোর অমাবস্যায় আমি মায়ের কাছে নরবলি দিই। তাই একমাত্র মা ছাড়া আর কাউকে ভয় করি না আমি। ওইভাবে আড়াল থেকে বিক্রম না দেখিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াও।'

সর্দার একথা বলার পরও কেউ এল না। এমনকী কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না কোথাও।

সর্দার হেসে বলল, 'আমি মায়ের সন্তান। আমার সঙ্গে চালাকি নয়।' তারপর তার লোকেদের বলল, 'যা একে দিঘিতে চান করিয়ে নিয়ে আয়।'

সর্দারের কথামতো ডাকাতরা রাধাকান্তকে নিয়ে গেল দিঘিতে স্নান করাতে।

রাধাকান্ত তখন একেবারেই নির্বাক। কেমন যেন বোধশক্তিহীন হয়ে গেছে সে। এমনকী তার চোখেও এক ফোঁটা জল নেই। মর্মান্তিক পরিণতির কাছে নিজেকে যেন সমর্পণই করে দিয়েছে সে। একটা জড় পুতুলের মতো দিঘির জলে সে স্নান করল। ডাকাতদের দেওয়া নতুন বস্ত্র পরল। তারপর এল বধ্যভূমে।

ডাকাতদের পুরোহিত মায়ের পুজো শেষ করে বলির নির্দেশ দিতেই এক ঘাতক খড়্গ হাতে এগিয়ে এল।

রাধাকান্ত নিজেই মাথাটা গলিয়ে দিল হাড়িকাঠে। যা কিছু করল তা সবই যন্ত্রচালিতের মতো। ডাকাতদলের দু'জন ঢোল আর কাঁসি বাজাতে শুরু করতেই পুরোহিত বলল, 'বলিদান পর্ব এবার শুরু করো।'

সবাই একসঙ্গে 'জয় মা' ধ্বনি দিল। আর তখন যা ঘটল তা সত্যই বিস্ময়কর। বলিদানের জন্য ঘাতক খড়্গ তুলতেই হঠাৎ সেটা ঘুরে গিয়ে

ঘাতকেরই মুণ্ডচ্ছেদ করে বসল। ছিন্নশির লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তারপর এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে একের পর এক ডাকাতের মুণ্ডচ্ছেদ হতে লাগল।

ডাকাত সর্দার প্রাণভয়ে কোন দিকে যে পালাবে তা ভেবে পেল না। যেদিকে যায় সেদিকেই দেখে শৃঙ্গবিশিষ্ট বিশাল এক দানব তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। জঙ্গলের গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে তার উচ্চতা। অথচ সেই দৈত্যের গলায় যজ্ঞোপবীত। সেই অতিকায় পুরুষ বললেন, 'ব্রহ্মহত্যা করার খুব শখ, না? ক্ষমতা থাকলে আমাকে বলি দে।'

ভয়ার্ত সর্দার বলল, 'কে? কে তুমি? আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না। চলে যাও আমার সামনে থেকে।'

দানবের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল এবার, 'আমি তো চলে যাব বলে আসিনি। তুই-ই ডেকে আনলি আমাকে। তখন বললি না, যদি সাহস থাকে তো আমার সামনে এসে দাঁড়াও। তাই তো এলাম আমি। তোর বলির মানুষটিকে আমি উদ্ধার করব। আজই কিন্তু তোর শেষ রাত।'

রাধাকান্ত তখন হাড়িকাঠ থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এইসব কাণ্ডকারখানা দেখছে। ডাকাতদের ছিন্নশির দেখে ভয়ে ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলেও ওই বিস্ময়পুরুষকে দেখে একটুও ভয় পেল না। কেননা সে বুঝেই গেছে ইনিই ওর রক্ষাকর্তা এবং এঁর প্রভাবেই এত সব কিছু হচ্ছে।

ডাকাত সর্দার এবার দু'হাত জোড় করে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'কে তুমি তা জানি না। তবে তুমি যে ভয়ানক শক্তিমান, তোমার অসাধ্য কিছু নেই তা বুঝতে পেরেছি। দেব-দানব-মানব-দৈত্য যেই হও না কেন তুমি, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি এখন থেকে ডাকাতি করা আমি ছেড়ে দেব। আমার সমস্ত ধনরত্ন আমি বিলিয়ে দেব দীন-দুঃখীদের মধ্যে।'

'খুব ভাল কথা। কিন্তু সে সুযোগ তো তুই পাবি নারে রায়রায়ান। আজই যে তোর শেষ রাত এবং এই মুহূর্তে।'

সর্দার চিৎকার করে উঠল, 'না-না-না-না' কিন্তু দানব ততক্ষণে দু'হাতে তার গলা টিপে অনেকে উঁচু থেকে তাকে দূরে নিক্ষেপ করেছে।

রাধাকান্ত অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সেই ভয়ঙ্কর দানবের দিকে। চেয়ে থাকতে থাকতেই সে দেখল সেই বৃহদাকার ধীরে ধীরে ছোট হতে হতে এক

জ্যোতির্ময় পুরুষে রূপান্তরিত হল। শৃঙ্গের বদলে তাঁর ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল। কপালে বৈষ্ণবদের মতো তিলক, গলায় যজ্ঞ উপবীত। শ্রীমুখে প্রসন্ন স্বর্গীয় হাসি। বললেন, 'খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলিস, তাই না?'

রাধাকান্ত বলল, 'তা একটু পেয়েছিলাম বইকি। তবে আমার রক্ষাকর্তা জেনে সামলেও নিয়েছিলাম। এখন বলুন আপনি কে? শুনেছি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হলে দেবতুল্য হয়। আপনি—'

'আমি ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবও। কাছেই দেবীপুরে আমার নিবাস ছিল। ওই দিঘির পিছনের বেলবনে আমার অধিষ্ঠান। তোকে দেখে আমার খুব মায়া হল রে। যাই হোক, আর তোর ভয়ের কোনও কারণ নেই। কেউ তোর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। এই নিশরাগড়ে নিশিযাপন করে কাল সকালেই তুই দেবীপুরে যা। ভোরের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোর ভাগ্যোদয়ও ওখানেই হবে।' একথা বলেই বিলীন হয়ে গেলেন জ্যোতির্ময়।

রাধাকান্ত এবার সাহসে বুক বেঁধে সেই ভয়ংকরী মুণ্ডমালিনীর সামনে এল। ডাকাতদের পুরোহিত তখন উধাও। ঢোল-কাঁসিটাও পড়ে আছে এক জায়গায়। দেবী প্রতিমার সামনে প্রসাদ সামগ্রী ছিল প্রচুর পরিমাণে। রাধাকান্ত তা থেকেই ওর পছন্দমতো যা পেল তাই খেয়ে পেট ভরাল। তারপর সেখানেই একপাশে শোওয়ার মতো একটু জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়ল টান হয়ে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কোনও দিকে না তাকিয়ে সেই দিঘির জলে চোখ-মুখ ধুয়ে পথ চলা শুরু করল। খানিক যাওয়ার পর পথে সঙ্গীও পেল একজনকে। ইনি এই গ্রামের ঘোষাল পরিবারের একজন। রাধাকান্তর দিব্যকান্তি দেখে মোহিত হয়ে তাকে নিয়ে এলেন দেবীপুরে।

নিশারাগড়ের ঘোষাল পরিবারের সঙ্গে দেবীপুরের জমিদারদের সখ্যতা ছিল খুব। এই সুন্দর সকালে দেবদূতের মতো রাধাকান্তকে দেখে সস্ত্রীক এগিয়ে এলেন কত্তামশাই। বললেন, 'এ তুমি কাকে নিয়ে এলে ঘোষাল?'

ঘোষাল বললেন, 'পরিচয় জানি না। মনে হচ্ছে খুবই সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। দেবীপুরের সন্ধান করছিল। তাই নিয়ে এলাম।'

জমিদারগিন্নি বললেন, 'কে তুমি বাবা? কী তোমার পরিচয়? এই গ্রামে কে আছেন তোমার?'

রাধাকান্ত ওর পরিচয় দিল। বলল, 'আমি বৈদ্যপুর থেকে আসছি। বর্ধমানে রাজপরিবারের রাধামাধবের সেবাপুজো করার প্রস্তাব পেয়ে আসছি।'

জমিদার ও জমিদারগিন্নি দু'জনেই সাদরে রাধাকান্তকে ভেতর মহলে নিয়ে গেলেন। তারপর অনেক আদরযত্ন করে নিজেদের ছেলের মতো ঘরে আশ্রয় দিয়ে গিন্নিমা বললেন, 'তোমাকে আর বর্ধমানে রাজপরিবারের শ্রীমন্দিরে যেতে হবে না বাবা। তুমি যাবে কাঞ্চননগরে। ওখানে মুখুজ্জেদের একমাত্র আদরিণী কন্যা স্বর্ণলতার জন্য তোমারই মতো একজনের খোঁজ করছিলাম আমরা। ওদেরই অষ্টধাতুর রাধাবিনোদের সেবা-পুজো তুমিই করবে। তোমার কোনও অভাব থাকবে না। আজই আমার লোকেরা কাঞ্চননগরে গিয়ে শুভ সংবাদটা দিয়ে আসবে। তারপর দিনক্ষণ ঠিক করে তোমার বাবা-মাকেও আমাদের পালকিবাহকরা গিয়ে নিয়ে আসবে সময়মতো।'

রাধাকান্ত স্বপ্নেও ভাবেনি কখনও যে এমন ভাগ্যোদয় তার জীবনে সত্যসত্যই হবে। মনে পড়ল সেই ব্রাহ্মণের কথা। যিনি ওর কপালের রেখা দেখে বলেছিলেন যুবচন্দ্রিমা যোগের কথা। শুধু তাই নয়, মধুচন্দ্রিমার কথাও বলেছিলেন। ও অবশ্য এ সবের কিছুই বোঝে না। শুধু বিগ্রহের সেবক হিসাবে রাজপরিবারের পক্ষ থেকে একটা মাস মাইনে পাবে সেই আশায় ঘর ছেড়েছিল। তারপরে যা হল তাতে তো জীবনে আশা ছেড়েই দিয়েছিল ও। ভাগ্যের চাকা আবার এক অলৌকিক প্রভাবে হঠাৎ করেই ঘুরে গেল। সেই অশরীরীর কথাও ফলে গেল অক্ষরে অক্ষরে। তবে এসব কথা ও কাউকে না বললেও রাতারাতি ডাকাত বিদায়ের বার্তাটা কিন্তু পৌঁছে গেল সর্বত্র। সবাই ভাবল ডাকাতরা নিজেদের মধ্যেই মারামারি করে নিপাত গেছে। তাই দুই গ্রামের মানুষেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওই ভয়ংকরী দেবীমূর্তির বিসর্জন দিল দিঘির জলে।

তারপর একদিন কাঞ্চননগরে যেতেই হল রাধাকান্তকে। অষ্টধাতুর রাধাবিনোদের সেবা-পুজোর দায়িত্ব শুধু নয়, সুন্দরী স্বর্ণলতার বরমাল্যও গ্রহণ করতে হল। বৈদ্যপুর থেকে ওর বাবা-মা দু'জনেই এলেন। তবে বেশিদিন রইলেন না তাঁরা। শুভকর্ম সম্পন্ন হলে পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করে আবার বৈদ্যপুরেই ফিরে গেলেন তাঁরা।

গিরিডিহির পোড়ো বাড়িটা

সেকালে দেওঘর, শিমুলতলা, মধুপুর ও গিরিডিহিতে অনেক বিত্তবান বাঙালির বাস ছিল। তাঁদের কেউ কেউ ওখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও অনেকেই থাকতেন কলকাতা বা অন্য কোথাও। মাঝে-মধ্যে অবসর বিনোদনের জন্য সেখানে গিয়ে থাকতেন। আত্মীয়-বন্ধুদের পাঠাতেন। বড়দিন অথবা পুজোর ছুটিতেই নিজেরা যেতেন বেশি।

গিরিডিহি বা গিরিডির শেষপ্রান্তে এমনই একটি বাড়ি অত্যন্ত অবহেলায় দীর্ঘদিন পড়ে ছিল। সে বাড়ির কোনও কেয়ারটেকারও ছিল না। বাড়িটিকে অনেকেই ভূতের বাড়ি বলত। তা বাড়ির মালিক ভদ্রেশ্বরবাবু মারা গেলে তাঁর দুই ছেলে এসে জলের দামে বাড়িটা বিক্রি করে দিল। তাদের বক্তব্য— আমরা কেউ আসি না, আসবও না। অতএব চোখের আড়ালে এই সম্পত্তি রেখেই বা লাভ কী? কোনও দিন হয়তো কেউ দখল করে নেবে। তার চেয়ে বিক্রি করে দেওয়াই ভাল।

প্রায় দশ কাঠা জমির ওপর পাকা গাঁথনির দোতলা বাড়ি। সেই বাড়ি কিনে নিলেন মধুপুরের মধুসূদন মুখার্জি। মধুবাবু কলকাতার লোক হলেও বরাবরই মধুপুরের বাসিন্দা। এখানকার অভ্রখনিতে একসময় ব্যবসায় সূত্রে যুক্ত থাকলেও এখন তিনি সম্পূর্ণ অবসর জীবন যাপন করছেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের সংসার। ছেলেমেয়ে নেই। তবু বিত্তবাসনা মাঝে-মধ্যেই তাঁর মনের ভেতর উঁকি মারে। বাড়িটা তাই কিনেই নিলেন তিনি। তবে নিজের বা গিন্নির নামে নয়। আদরের ভাইপো শুভেন্দুর নামে।

শুভেন্দু হল দাদার একমাত্র সন্তান। বংশের প্রদীপ। মধুসূদনের যা কিছু সব তো শুভেন্দুরই। তা সে-ই যখন সবকিছুর অধিকারী তখন বাড়ি আর নিজের নামে কেনা কেন? সেজন্যই ভবিষ্যৎ চিন্তা করে শুভেন্দুর নামেই কেনা হল বাড়িটা। বাড়ি কেনার পর একজন রাজমিস্ত্রিকে ডেকে বাড়ির ভেতরের দিকটা বেশ ভালভাবে মেরামত করিয়ে চুন-কলি ধরিয়ে বসবাসের উপযুক্ত করে তুললেন। তারপর একটা চিঠি লিখে ডাকে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতার বাড়িতে।

চিঠি পেয়ে সে কী আনন্দ শুভেন্দুর। বাবা-মা দু'জনকেই দেখাল সে চিঠিটা।

বাবা বীরু মুখার্জি চিঠি পড়ে বললেন, 'মধুটার দেখছি মাথা খারাপ। এইভাবে অর্থের অপচয় করার কোনও মানে হয়? কলকাতার এই সুখ-ঐশ্বর্য ছেড়ে সে কেন যাবে গিরিডিতে?'

মা বললেন, 'কী আশ্চর্য! ও ওখানে বারোমাস থাকবে নাকি? যখন ওর মন হবে তখনই যাবে। কত লোকের কত বাড়ি তো রয়েইছে ওখানে। ঠাকুরপো আমার ছেলের নামে বাড়ি কিনেছে এ কি কম আনন্দের কথা?'

বাবা বললেন, 'আনন্দের কথা তো নিশ্চয়ই। তবে বাইরে কোনও প্রপার্টি রাখলে দেখাশোনার জন্য কাউকে বহাল করতে হয়।'

শুভেন্দু বলল, 'এখন ওসব আলোচনা থাক না। আগে কাকামণির ওখানে যাই। গিরিডিতে যাই। তারপর অন্য চিন্তাভাবনা করব। বাড়িতে লোক রাখলে মাসে মাসে তার মাইনে গুনতে হয়। তেমন বুঝলে নীচের তলার একটা ঘরে কাউকে ভাড়া বসিয়ে দেব।'

বীরু মুখার্জি হেসে বললেন, 'এই তো কিছুদিন হল স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে কলেজে ঢুকেছিস। এর মধ্যেই এইসব বৈষয়িক বুদ্ধি তোর মাথায় এল কী করে?' তারপর বললেন, 'নাঃ! তুই-ই পারবি সব কিছু বজায় রাখতে।'

মা বললেন, 'আর পাঁচ-ছ'দিন বাদেই তো পূর্ণিমা। চলো, সবাই গিয়ে ওইদিন বেশ ভাল করে ওই বাড়িতে হোম-যজ্ঞ করিয়ে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসি।'

বীরুবাবু বললেন, 'সেই ভাল। তোমরা মা-ছেলে দু'জনেই যাও। আমার এখন অফিস কামাই করা একদমই চলবে না। আমি একেবারে সেই পুজোর ছুটিতেই যাব।'

শুভেন্দু বলল, 'আমরা দু'জনে কেন? আমার বন্ধুদেরও বলি। অজয়, সুজয়, বিমলও যদি যায় তো দারুণ হবে। শুধু এই যাত্রা বলে তো নয় যখন-তখনই যাব। ওখানে উশ্রীর জলপ্রপাত আছে। কী সুন্দর! দু'-দু'বার দেখেছি আমি। অবশ্যই কাকামণির ওখান থেকে। তা ওই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে আমরা পিকনিকে যাব সময় পেলেই। তা ছাড়া গিরিডির মতো জায়গায় আমার একটা বাড়ি আছে শুনলে সবাই ওখানে যখন-তখনই স্বাস্থ্যোদ্ধারে যেতে চাইবে। আমি তো যাবই।'

বীরুবাবু বললেন, 'তোর যা উৎসাহ দেখছি তাতে মনে হচ্ছে তুই-ই পারবি বাড়িটার সদ্ব্যবহার করতে।'

আনন্দের আতিশয্যে শুভেন্দু যে কী করবে কিছু ভেবে পেল না। মাকে বলল, 'মা! তুমি তাহলে গোছগাছ করো। আজ তো হবে না। কালই আমরা সন্ধের সময় রওনা দিই, চলো। এখন শীতের শেষ হলেও ওদিকে কিন্তু শীতের কামড় খুব বেশি।'

'তোর বন্ধুদের খবর দে তাহলে।'

'আমি এখনই যাচ্ছি। দেখি কে কে যেতে রাজি হয়। সত্যি, কী আনন্দ যে হচ্ছে আমার।'

শুভেন্দু চলে গেল বন্ধুদের খবর দিতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অজয়-সুজয়-বিমল ও কৌশিক নামে ওদের আরও এক বন্ধুকে নিয়ে হাসিমুখে ফিরে এল।

মা বললেন, 'ব্যাপারটা কী? এ যে দেখছি চাঁদের হাট।'

অজয় বলল, 'তা যা বলেছেন। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে যে একটা সুখবর পাব তা আমরা ভাবতেও পারিনি। এইটুকু সময়ের মধ্যে আমরা কী পরিকল্পনা করেছি জানেন?'

'কী করে জানব বল?'

'আমাদের পরিচিতরা কেউ যদি না যায় তখন পুজো অথবা শীতের

মরশুমে আমরা ওই বাড়ির নীচের তলায় ভাড়া খাটাব। আমাদের মধ্যে থেকে কেউ না কেউ গিয়ে তখন থাকব ওখানে। আর যদি নিজেরা দল বেঁধে যাই তাহলে তো অন্য কথা।'

মা প্রত্যেককে চা-টোস্ট দিয়ে বললেন, 'বাড়ি আমার ছেলের নামে হলেও ও বাড়ি তোমাদের প্রত্যেকেরই। তোমরা সবাই মিলে এগিয়ে এলে দারুণ হবে কিন্তু। সময় পেলে তোমরাও তোমাদের মা-বাবাকে নিয়ে যাবে। আনন্দ করবে। মোট কথা যাতায়াত করতে হবে। নজর রাখতে হবে বাড়ির ওপর।'

বন্ধুরা অনেকটা সময় থেকে বিদায় নিল সবাই। ঠিক হল পরদিন সন্ধের সময় সবাই গিয়ে হাজির হবে হাওড়া স্টেশনে।

বন্ধুরা চলে গেলে শুভেন্দুও ওর প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই গুছিয়ে নিল একটা ব্যাগের মধ্যে। খুব বেশিদিন না হলেও দিন দশেক তো থাকতেই হবে ওখানে।

সারাদিনে গোছগাছ যখন শেষ তখন রাত্রিবেলা বীরুবাবু অফিস থেকে ফিরে বললেন, 'আমিও যাচ্ছি রে তোদের সঙ্গে। অফিসের সবাই বলল, ছেলের নামে বাড়ি হয়েছে অথচ আপনি যাবেন না এ কি হয়? যান আপনি মনের আনন্দে। চার-পাঁচটা দিন আমরা ম্যানেজ করে নিতে পারব। তা ছাড়া ধরুন না হঠাৎ যদি আপনার শরীরটা খারাপ হয়ে যেত তখন আপনি কী করতেন?'

বাবাও যাবেন সঙ্গে তাই আনন্দ যেন চরমে উঠল শুভেন্দুর।

বীরুবাবু বললেন, 'আমার তো বেশিদিন থাকা হবে না। এক রাত কি দু'রাত থেকে বাড়ির পুজো দিয়েই তোর মাকে নিয়ে চলে আসব। তুই বরং বন্ধুদের নিয়ে থেকে যাবি কয়েকটা দিন।' তারপর বললেন, 'আমার অফিসের বন্ধুদেরও খুব ইচ্ছে মাঝে-মধ্যে ছুটিছাটা পেলেই সপরিবারে ওখানে যায়। গিরিডি থেকে পরেশনাথ অথবা দেওঘর বা শিমুলতলাও ঘুরে আসতে পারবে।'

শুভেন্দু উল্লসিত হয়ে বলল, 'এমন তো আমিও চাইছি।'

মা বাবাকে বললেন, 'তবে? তুমি তো বাড়ি কেনার নাম শুনে আগেই বেঁকে বসেছিলে।'

দারুণ আনন্দে নানা আলোচনার মধ্য দিয়ে সে রাত্রি প্রভাত হল একসময়।

সারাদিন নানা কাজের ফাঁকে কাটিয়ে সন্ধ্যায় সবাই এসে হাজির হল হাওড়া স্টেশনে। রাত ন'টায় মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারে রওনা। পরদিন সকালে আটটায় মধুপুর। বীরুবাবু গিয়ে প্রত্যেকের টিকিট কেটে আনলেন।

ট্রেনে তখন এমন বিপজ্জনক ভিড় ছিল না। তাই সবাই মিলে শুয়ে-বসে আনন্দেই রাতটা কাটাল। দু'তিনটে বাঙ্কও দখল করতে পেরেছিল ওরা তাই রক্ষে।

সকালে ট্রেন থেকে নেমে হাঁটাপথেই সবাই এসে হাজির হল মধুসূদনের বাসভবনে।

মধুসূদন ভাবতেও পারেননি তাঁর দাদা-বউদিও আসবেন বলে। স্ত্রী প্রতিভাও অভিভূত। ভাসুর ও জা'কে দেখে মাথায় ঘোমটা টেনে চরণে লুটিয়ে পড়লেন। এরপর আনন্দের যেন বন্যা বয়ে গেল।

সবাই ভেতরে ঢুকলে শুভেন্দু ও তার বন্ধুদের জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দিলেন মধুসূদন। দাদা-বউদির আলাদা ঘর। দারুণ ব্যবস্থা হয়ে গেল। এ বাড়িতে মোট চার-পাঁচটি ঘর থাকায় কোনও অসুবিধেই হল না। বিশ ইঞ্চি গাঁথনির একতলা বাড়ি। মধুসূদনের নিজস্ব। পিছনে বাগান, কুয়ো। তাঁর অবর্তমানে এ বাড়িও শুভেন্দুর।

বীরুবাবু ভাইকে বললেন, 'তুই গিরিডিতে বাড়ি কিনেছিস শুনে প্রথমটায় খুব আপত্তি করেছিলাম। বাইরের প্রপার্টি। দেখাশোনাই বা করবে কে? কিন্তু যার নামে বাড়ি কিনেছিস তার উৎসাহ ও পরিকল্পনার কাছে হার মানতেই হল। তাই আমিও ওদের সঙ্গে বাড়ি দেখতে না এসে পারলাম না।'

'বেশ করেছ। এ না হলে তো আসাই হত না।'

এরপর হরিচন্দন নামে একজনকে দিয়ে দোকান-বাজার ইত্যাদি করালেন মধুসূদনবাবু।

দারুণ জলযোগ হল। শিঙারা, কচুরি, জিলিপি, প্যাঁড়া, এদেশীয় লাড্ডু, কত কী। শুভেন্দুর বন্ধুরা, আতিথেয়তা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল।

ওদের জলযোগ পর্ব শেষ হলে মধুসূদনবাবু বললেন, 'তোমরা আর

ঘরে বসে থেকে কী করবে? আশপাশের চারদিক একটু ঘুরে-বেড়িয়ে এস। এখানকার গুরু দরবারে যেতে পারো। সোনার অন্নপূর্ণা আছে সেখানে। তারপর দুপুরে স্নানখাওয়া হলে হরিচন্দন তোমাদের গিরিডিতে নিয়ে যাবে বাড়ি দেখাতে।'

উত্তম প্রস্তাব। চা-পর্বের পর সবাই ওরা ঘুরতে চলল।

বীরুবাবু তাঁর স্ত্রী আগামীকাল দুপুর অথবা সন্ধ্যায় ওই বাড়িতে যাতে পূজা-পাঠের জন্য একটা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়, মধুসূদনের সঙ্গে সেই বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

মধুবাবু ও তাঁর স্ত্রী দু'জনেই একমত হয়ে বললেন, 'অবশ্যই এটা করা উচিত। বিশেষ করে সবাই যখন এসে পড়েছ তখন রাতারাতি সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

মধুবাবু বললেন, 'আমি এখনই যাচ্ছি জনার্দন পূজারির কাছে। কাল তো পূর্ণিমা। বড়ই শুভদিন। কাল পুজো দিয়ে সবাই মিলে রাত্রিবাস করব ওখানে।'

এরপর দু'জনে নানা কথাবার্তা ও কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন।

বীরুবাবু ও মধুবাবু গেলেন জনার্দন পূজারির খোঁজে।

অনেক বেলায় ওঁরা ফিরে এলেন প্রচুর কেনাকাটা করে। সবই অবশ্য পূজার সামগ্রী। সকাল ছ'টা নাগাদ একটা ট্রেন মধুপুর থেকে গিরিডি যায়। সেই ট্রেনেই সকলের যাওয়ার পরিকল্পনা হল।

শুভেন্দুরা অনেক বেলা পর্যন্ত এদিক-সেদিক করে ঘুরে এসে স্নান-খাওয়ার পর হরিচন্দনের সঙ্গে সবাই চলল গিরিডির বাড়ি দেখতে।

দুপুর দুটো নাগাদ রওনা হল ওরা।

সময়টা শীতের শেষ। তবু এদেশে শীতের দাপট খুব বেশি। তা হোক, গিরিডির মতো স্বাস্থ্যকর স্থানে একটি নিজস্ব আস্তানা হওয়ায় শুধু শুভেন্দু নয়, বন্ধুরাও খুব খুশি। সবারই অধীর আগ্রহ কতক্ষণে সেই বাড়িতে গিয়ে পৌঁছবে।

গিরিডি স্টেশনে পৌঁছলে ট্রেন থেকে নেমে ওরা হাঁটাপথেই চলল বাড়ির দিকে।

একসময় বাড়িতে পৌঁছল। খুব একটা ছোটখাটো বাড়ি যে তা নয়। এর পিছনেই বনময় পরিবেশে উশ্রী নদী।

অজয় চমকিত হয়ে বলল, 'এই সেই উশ্রী?'

শুভেন্দু বলল, 'হ্যাঁ, তবে প্রপাত অনেকদূরে। সময়মতো একদিন সবাই যাব ওখানে।'

হরিচন্দন তালা খুলে দিলে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল ওরা।

ওদের দেখে স্থানীয় দু'চারজন বাঙালি ও বিহারিও এলেন।

একজন প্রবীণ বাঙালি বললেন, 'মধুবাবুকে আমি অনেক করে বলেছিলাম, এ বাড়ি কিনবেন না। কিন্তু শুনলেন না আমার কথা। এখন টিকতে পারবেন কি না দেখুন।'

আর একজন বললেন, 'দেখাই যাক না কী হয়। টিকতে না পারলে যেমনকার বাড়ি তেমনই থাকবে। তবে দীর্ঘ বিশ বছর পরে সংস্কার তো হল।'

শুভেন্দুর বন্ধুরা সব শুনে বলল, 'কেন, টিকতে পারব না কেন?'

'পোড়ো বাড়িতে চোর-ডাকাতের উপদ্রব হয়, তাই। কিন্তু এখন তো আর সে সম্ভাবনা নেই।'

এখানকার যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা আর কেউ কিছু বললেন না। একে একে বিদায় নিলেন।

হরিচন্দন বলল, 'আপনারা বাড়ি দেখুন। আমি বাইরে আছি।'

হরিচন্দন চলে গেলে ওরা সবাই প্রতিটি ঘর ঘুরে দেখল। বেশ বড় ঘর এক একটি। মোট চারটে ঘর। চওড়া দালান। ওপরেও তাই। নতুন কলি ও জানলা-দরজার রঙের গন্ধে ভরে আছে চারদিক। ওপরে ওঠার সিঁড়িও বেশ চওড়া।

অজয় বলল, 'তুই সত্যিই খুব ভাগ্যবান রে, শুভেন্দু। আমার তো মনে হচ্ছে আজ আর মধুপুরে নয় এ বাড়িতে থেকে যাই। নেহাত পুজোআর্চার একটা ব্যাপার আছে তাই, না হলে থেকেই যেতাম।'

এবার ওরা দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠল। চারদিকের প্রকৃতি দেখে মুগ্ধ হল সকলেই। কত গাছগাছালি, অভ্রের কণা মাখা চিকচিকে পথ, দূরে পাহাড়ের রেখা, উশ্রী নদী। কী সুন্দর!

দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে এল।

বাড়ির বাইরে থেকে হরিচন্দনের গলা শোনা গেল, 'বাবুজিরা, নেমে আসুন, ট্রেনের সময় হয়ে গেছে।'

ওরা যখন নামতে যাবে তখনই এক কেলেঙ্কারি। বাড়ি ফাঁকা পেয়ে কেউ বোধহয় ওপরে উঠছিল। হঠাৎ পা হড়কে পড়ে গেছে। তাই ধপাস করে একটা শব্দ ও 'উঃ মাগো' বলে আর্তনাদ। সেই সঙ্গে একটা কলসির সিঁড়ি বেয়ে ঠং ঠং করে গড়িয়ে পড়ার শব্দ।

শুভেন্দু চমকে উঠে বলল, 'আশ্চর্য। জলের কলসি নিয়ে ওপরে উঠছিল কে?'

কৌশিক বলল, 'কে আবার? কেউ না কেউ উঠছিল। তোর ওই হরিচন্দনদাদা হয়তো পাঠিয়েছিল কাউকে।'

ওরা আর ছাদে না থেকে জলে ভেজা সিঁড়ি বেয়ে কোনও রকমে নামল নীচে। কিন্তু কোথায় কে? না দেখা মিলল কারও, না পাওয়া গেল কলসিটা।

ওরা সবাই নীচে নেমে বাড়ির বাইরে এসে হরিচন্দনকে সে কথা বলতেই হরিচন্দন বলল, 'আমি তো কাউকে পাঠাইনি। তা ছাড়া আমি নীচে দরজার কাছেই আছি। মনে হয় পাশের কোনও বাড়িতে হয়েছে ওরকম। জলভরা কলসি নিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে পড়েছে কেউ।'

শুভেন্দু বলল, 'তা কী করে হয়? আমরা সবাই দেখেছি। সিঁড়ি ভর্তি জল।'

হরিচন্দন আর কিছু বলল না। শুধু বলল, 'আসুন, চা খাবেন তো আসুন। ট্রেনেরও সময় হয়েছে।'

ওরা আর কেউ কোনও কথা না বলে একটি চায়ের দোকানে গিয়ে বসল।

হরিচন্দন বলল, 'আমি গিরিডিতে এলেই এই দোকানের চা খাই। মশলা দেওয়া দারুণ চা। খেয়ে দেখুন।'

চা খেতে খেতে ওরা ওই বাড়ির ব্যাপারটা নিয়ে যখন আলোচনা করছে তখন দোকানদার বিজু বলল, 'কিছু মনে করবেন না বাবুজি, ওই বাড়ি কিনেছেন বটে আপনারা তবে টিকতে পারবেন না। রাতে যে ওখানে কী হয় তা আমরাই জানি।'

শুভেন্দু বলল, 'কী হয় শুনি তবু?'

'কে আর ওর ভেতরে ঢুকে দেখতে গেছে বলুন? তালা দেওয়া বাড়ি তো। কখনও কোনও মেয়ে গলায় কান্না শোনা যায়। কখনও গান গায় কেউ। মাঝে মাঝে হয় নানারকম শব্দ।'

কৌশিক বলল, 'তাহলে এবার হবে জব্দ। আমরা এই পঞ্চরত্ন এমন উপদ্রব করব যে রাতারাতি থেমে যাবে সব।'

বিমল নামে যে বন্ধুটি সে বোধহয় একটু ভয় পেয়েছে। বলল, 'কী করে জব্দ করবি? সামান্য ওই কলসির জল যে ফেলল তারও কোনও সন্ধান পেলি কি?' তারপর একটু চুপ থেকে বলল, 'ওইসবের মধ্যে আমি নেই। কাল সারাদিন এখানে হইচই করে কাটালেও রাতে কিন্তু আমি মধুপুরেই থাকব। কেউ বাধা দিবি না আমাকে।'

অজয় আর সুজয় বলল, 'যা তোর মনে হবে তাই করবি। আমরা কিন্তু এখানেই থাকব। শহরের ছেলে আমরা, ভূত কখনও দেখিনি তো, তাই ভূতের সঙ্গে বন্ধুত্ব অথবা লড়াই করব।'

চা পর্ব শেষ হলে সবাই ওরা স্টেশনে এসে ট্রেন ধরল। তারপর মধুপুরের বাড়িতে এসে আনন্দে মুখর হয়ে উঠল সবাই। অবশ্য বিমল বাদে। ও কোনও ব্যাপারেই উৎসাহ দেখাল না বা কোনও কিছুতেই যোগ দিল না।

পরদিন ভোর থেকেই যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হল। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই স্টেশনে এলেন সবাই। সস্ত্রীক মধুসূদন, স্ত্রীসহ বীরুবাবু, শুভেন্দু ও তার বন্ধুরা। ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্তে জনার্দন পূজারিও এলেন।

মধুপুর থেকে গিরিডি ঘণ্টাখানেকের জার্নি। তাই খুব একটা অসুবিধে হল না।

স্টেশন থেকে হাঁটাপথের রাস্তায় গিরিডির সেই বাড়ি। তাই অনায়াসে চলে এলেন সবাই। মধুসূদনবাবুর কাছে ঘরের চাবি ছিল। তালা খুলে সবাইকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। দাদা-বউদি অর্থাৎ বীরুবাবু ও তাঁর স্ত্রী ভেতরে ঢুকেই চমকিত হলেন।

বীরুবাবু বললেন, 'গিরিডির মতো জায়গায় এমন বাড়ি! এ তো ভাবাই যায় না। এই বাড়ি দেখে আমার মনে হচ্ছে আর কলকাতায় নয়, এখানেই থেকে যাই।'

শুভেন্দু ও তার বন্ধুরা হইহই করতে লাগল। বিমলের বোধহয় ভয় একটু কেটেছে। তাই সেও এবার মেতে উঠল সবার সঙ্গে। তবে গতকালের ব্যাপারটা নিয়ে কেউ আর কোনও আলোচনা করল না। এমনকী বীরুবাবু-মধুবাবুর কানেও তুলল না কথাটা।

এ বাড়ির সংলগ্ন দেড় কাঠা জমির ওপর বাগান ও কুয়ো। দড়ি-বালতি নিয়ে সেখান থেকে জল এনে পুজোর জায়গাটা বেশ ধুয়ে-মুছে নিলেন দুই জায়ে।

জনার্দন পূজারিও পুজোর আয়োজন করতে লাগলেন।

মধুবাবুর নির্দেশে পাশের দোকান থেকে চা এল।

জলখাবারের জন্য শিঙাড়া-কচুরি-রাবড়ি-প্যাঁড়ার ব্যবস্থাও হল।

বীরুবাবু ও মধুবাবুর স্ত্রী অবশ্য চা ছাড়া অন্য কিছু মুখে দিলেন না। পুজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই খাবেন না ওঁরা।

বেলা দশটা নাগাদ পুজোয় বসলেন জনার্দন পূজারি।

ইতিমধ্যে হরিচন্দনও পরের ট্রেনে এল দু'জন লোক ও রান্নার সরঞ্জাম নিয়ে।

ঘুঁটে-কয়লায় দুটো উনুন ধরিয়ে শুরু হল রান্না। বহুদিনের পুরনো এই পোড়ো বাড়িটা এতদিনে যেন প্রাণ ফিরে পেল।

শুভেন্দু ও তার দলবল মনের আনন্দে গিরিডি শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়াতে লাগল। বহুজনের সঙ্গে পরিচয় হল। তবে কেউ আর ভূতের ভয় দেখাল না।

পুজো-হোম শেষ হতে হতেই দুপুর দুটো বেজে গেল।

এরপর খাওয়া-দাওয়া। ভাত, ডাল, দু'তিনরকম ভাজা, আলু-ফুলকপির তরকারি, মাছের কালিয়া, চাটনি, মিষ্টি। দারুণ ব্যাপার।

বিকেলের ট্রেনে জনার্দন পূজারি সহ হরিচন্দন ও তার দু'জন সঙ্গী বিদায় নিল। মধুবাবু ও বীরুবাবুরা শুধু রয়ে গেলেন। আর রইল শুভেন্দু ও তার বন্ধুরা। বিমলও আর রাত্রিবাসের ব্যাপারে না করল না।

মধুবাবু ও বীরুবাবুরা শুলেন নীচের ঘরে। এখানকার একটি লজ থেকে গদি-কম্বল ভাড়া নিয়ে এলেন। শুভেন্দুদের জন্যও দোতলায় একই ব্যবস্থা হল। তবে মোমবাতি, হ্যারিকেনেই হল আলোর ব্যবস্থা। রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা হল এখানকারই একটি দোকানে।

খাওয়া-দাওয়ার পর অনেক রাত পর্যন্ত পাঁচ বন্ধুতে গল্প করে কাটাল। তারপর গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল সবাই।

রাত তখন কত তা কে জানে? হঠাৎই একটি জল ভরতি কলসি সিঁড়ির ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ার শব্দ এবং সেইসঙ্গে মেয়ে গলার তীব্র আর্তনাদ শুনে ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সবাই। আতঙ্কে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠল সকলের মুখ।

শুভেন্দু ও অজয় সবার আগে টর্চ নিয়ে ছুটে গেল দরজার কাছে। বিমল কৌশিককে জড়িয়ে ধরে গোঁ-গোঁ শব্দ করতে লাগল। সুজয়ও ভয়ে কাঁপতে লাগল।

এদিকে রহস্য ঘনাল অন্য জায়গায়। শুভেন্দু ও অজয় অনেক চেষ্টা করেও দরজা খুলতে পারল না। কী যে হল ব্যাপারটা বুঝতেই পারল না ওরা। সেদিনের মতো আবার কে মুখ থুবড়ে পড়ল ওখানে? তা ছাড়া দরজাই বা খুলছে না কেন?

অজয় বলল, 'মনে হচ্ছে বাইরের দিক থেকে কেউ শিকল তুলে দিয়েছে?'

শুভেন্দু বলল, 'সর্বনাশ। তাহলে ঘর থেকে বেরবো কী করে? এখান থেকে চেঁচিয়ে ডাকলেও নীচের ওরা শুনতে পাবে না।'

'ধর, ওঁদের ঘরেও যদি এইভাবে কেউ শিকল তুলে দিয়ে থাকে?'

শুভেন্দু তবুও চেঁচাতে লাগল, 'কে? কে দরজায় শিকল দিয়েছে? খোলো শিগগির।'

কোনও উত্তর এল না। তবে ঝনাৎ করে শিকলটা খুলে গেল।

ওরা দালানে বেরিয়ে দেখল জায়গাটা জমাটবাঁধা অন্ধকারে ঢাকা। টর্চের আলো ফেলতেই বোঝা গেল ছাদে ওঠার সিঁড়ি, দালান সবই জলে ভরা।

সিঁড়ির ওপরে ছাদে ওঠার দরজায় খিল তো দেওয়াই আছে। তাহলে? এ কী করে সম্ভব?

হঠাৎই ছাদের ওপর দিয়ে একটা লোহার বল গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ এবং এক উজ্জ্বল আলোর জ্যোতি দরজার নীচের ফাঁক দিয়ে নজরে এল ওদের।

ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য শুভেন্দু দ্রুত ওপরে উঠে গেল। অজয় বারবার বারণ করল, 'যাস না, যাস না, শুভেন্দু।'

শুভেন্দু বলল, 'যেতে আমাকে হবেই। তুই ওখানে থাক। যদি আমার কোনও বিপদ হয় তাহলে নীচে গিয়ে আমার বাবা-কাকাকে খবর দিবি।'

'তবু তুই যাবি?'

শুভেন্দু আর কোনও কথা না বলে ছাদের দরজার খিল খুলে ওপরে উঠতেই দেখল প্রকাণ্ড সাইজের একটি অগ্নিগোলক ছাদ থেকে লাফিয়ে ওদের বাগানে পড়ল। ও ছুটে আলসের ধারে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে বাগানে তাকিয়ে দেখল সেই অগ্নিগোলকের চিহ্নমাত্রও নেই।

ও ধীরে ধীরে দালানে নেমে এল। অজয় বলল, 'কী দেখলি?'

'কিছুই না। সব ভ্যানিশ!'

অজয় বলল, 'আমি কখনও ভূতে বিশ্বাস করতাম না। এখন যা অভিজ্ঞতা হল তাতে আর অবিশ্বাস করতে পারছি না।'

শুভেন্দু বলল, 'তুই ঘরে যা। আমি গিয়ে নীচেটা দেখে আসি আমার মা-বাবা, কাকা-কাকিমার ঘরে কেউ শিকল দিয়ে রেখেছে কি না। বা ওঁরা অলৌকিক কোনও কিছু টের পেয়েছেন কিনা।'

অজয় বলল, 'তুই একা যাস না। আমিও যাব তোর সঙ্গে।'

অতএব টর্চের আলোয় পথ দেখে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল দু'জনে। সেই মুহূর্তে দেখতে পেল অন্ধকারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এক তরুণী দ্রুত রান্নাঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

শুভেন্দু জোর গলায় বলল, 'কে? কে ওখানে?' বলেই রান্নাঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে টর্চের আলো ফেলল।

কিন্তু কোথায় কে? কেউ তো নেই ভেতরে।

এবার যেন বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে ওর গলা শুনে বাবা-মা, কাকা-কাকিমা সবাই উঠে পড়েছেন।

বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'কী হয়েছে রে, শুভ?'

'কিছু না। মনে হল কে যেন রান্নাঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।'

কাকা মধুসূদনও উঠে এসেছেন তখন। বললেন, 'ও কিছু না, মনের ভুল। যা, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়।'

যাক বাবা-কাকা যে কিছু টের পাননি এই ঢের। শুভেন্দু ও অজয় আবার দোতলায় ওদের ঘরে এল। সুজয়, কৌশিক ও বিমলের আতঙ্ক তখনও দূর হয়নি।

আর্তস্বরে বিমল বলল, 'সকালটা একবার হলে হয়।'

সুজয় বলল, 'কিছু মনে করিস না শুভেন্দু, এ বাড়ি আর যাই হোক বসবাসের উপযুক্ত নয়। কেউ যাক না যাক কাল সকালে আমি কিন্তু বিদায় নেব।'

বিমল বলল, 'আমি তো যাবই।'

কৌশিক বলল, 'আমারও মনটা কেমন ভেঙে গেছে রে।'

শুভেন্দু বলল, 'সত্যি, যা হয়ে গেল তাতে আমিই বা তোদের থাকতে বলি কী করে বল? আমারও মন বলছে তোদের সবারই চলে যাওয়া উচিত। কেননা যদি কোনও অঘটন হয় তার দায়টা কিন্তু সম্পূর্ণ আমার ওপরই বর্তাবে।'

অজয় বলল, 'তুই যাবি না?'

'না। আমি এর শেষ পর্যন্ত দেখে তারপর যাব। তবে একটা অনুরোধ, এইসব অলৌকিক ব্যাপারের কথা আমার বাবা-মা যেন জানতে না পারেন। তাহলে ওঁরা আমাকে থাকতে দেবেন না।' তারপর একটু চুপ থেকে বলল, 'কাল সকালের ট্রেনেই আমার মা-বাবা, কাকা-কাকিমা সবাই চলে যাবেন। তোরা যদি উশ্রী জলপ্রপাত দেখতে চাস তাহলে সেখান থেকে ঘুরে এসে দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর এখান থেকেই বাসে দেওঘর হয়ে চলে যাবি। তাতে বেড়ানোও হবে তোদের। না হলে বিকেলের যে কোনও ট্রেনে মধুপুর গিয়ে হাওড়ার ট্রেন ধরবি।'

অজয় বলল, 'তুই তাহলে থেকেই যাবি এখানে?'

শুভেন্দু বলল, 'হ্যাঁ, বাড়িটা তো আমার; কাজেই ভূতের ভয়ে নিজের ঘরের অধিকার আমি ছাড়ব কেন?'

আর কোনও কথা নয়। সিদ্ধান্ত একেবারেই পাকা।

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই চা-পর্ব সমাধা হল। নতুন বাড়িতে রাত্রিবাস করে বাবা-মা, কাকা-কাকিমা খুবই আনন্দ পেলেন।

কাকা মধুসূদন এখানকারই দয়ালজি নামে একজনের হাতে শুভেন্দু ও তার বন্ধুদের দায়িত্বভার তুলে দিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হলেন।

বেলা আটটা নাগাদ দয়ালজি কেরোসিন, স্টোভ, হাঁড়ি-কুড়ি, কড়া-খুন্তি ইত্যাদি নিয়ে হাজির হলেন। বললেন, 'তোমরা দোকান-বাজার করো। কমলা এলে রান্না থেকে আরম্ভ করে সব কিছু করে দেবে। কাছেই বাজার-দোকান। কোনও অসুবিধে হবে না তোমাদের। তবু যদি কিছু হয় তাহলে আমাকে বলবে। চা-দোকানের পাশেই আমার ভ্যারাইটি স্টোর্স। আমি না থাকলে আমার দোকানে যে থাকবে তাকেই বলবে। আর একটা কথা, বাড়িটার খুব বদনাম আছে। অনেকে অনেক কথাই বলবে। কান দেবে না কারও কথায়। কাল রাতে যে ছিলে, কোনও ভয়ের ব্যাপার কিছু হয়নি তো?'

শুভেন্দু বলল, 'কিছু না। এক ঘুমে সকাল করে দিয়েছি।'

'খুব ভাল কথা। ভয়-টয় পেলে চেঁচিয়ে ডাকবে।'

কথা বলতে বলতেই কমলা এসে গেল। ঘোর কৃষ্ণবর্ণের পাতলা ছিপছিপে চেহারার ষোলো-সতেরোর বছরের একটি মেয়ে। এসেই বলল, 'এই ভূতের বাড়িতে আমি কাজ করব ঠিকই, তবে রাতে যদি থাকতে হয় তাহলে আমার বোন কাজলিকে নিয়ে থাকব। একা থাকব না।'

শুভেন্দু বলল, 'রাতে তোমাকে থাকতে হবেও না। আমি একাই থাকব এখানে। আমার এই বন্ধুরা উশ্রী ঝরনা দেখে এসেই খেয়ে দেয়ে বিদায় নেবে।'

শুনে দয়ালজি বললেন, 'না না। তা কী করে হয়? এইরকম একটা বাড়িতে তোমার একা থাকাটা তো ঠিক হবে না বাবা।'

শুভেন্দু বলল, 'ও নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনি বরং আমাদের জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিন। আমরা উশ্রী ঝরনাটা দেখে আসি।'

'সে ব্যবস্থা এখনই হয়ে যাবে। তোমাদের দুপুরের খাওয়ার মেনুটা কী?'

'স্রেফ ডিমের ঝোল আর ভাত। দোকান থেকে একটু খাট্টা দহি কিনে নেব। তাতেই হয়ে যাবে। দুপুর দুটো নাগাদ একটা ট্রেন আছে। আমার বন্ধুরা আজই বিদায় নেবে সেই ট্রেনে।'

দয়ালজি বললেন, 'তাহলে আর দেরি কোরো না। আমার সঙ্গে এসো, আমি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। দশ টাকার মতো ভাড়া পড়বে। তোমাদের দুপুরের খাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থেকো। এখন এসো।'

ওরা আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে দয়ালজির পরিচিতের গাড়িতে উশ্রী ঝরনা দেখতে রওনা দিল। দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে ফিরেও এল। তারপর স্নানাহারের পাট চুকিয়ে দুটোর ট্রেনে বিদায় নিল সবাই।

শুভেন্দু একাই সাহসে ভর করে রয়ে গেল সেই নির্জন বাড়িতে। বন্ধুরা চলে গেলে ও চারদিক আপনমনে ঘুরে বেড়াল। তারপর কাছেরই একটা দোকান থেকে গরম রুটি-তড়কা ও কয়েকটা প্যাঁড়া কিনে রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করল। কমলা নামের মেয়েটি অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে।

সন্ধে উত্তীর্ণ হতেই নিঝুম হয়ে গেল চারদিক। লোকজনের যাতায়াতের কোলাহলও যেন কমে গেল। অর্ধেক দোকানপাটও বন্ধ হয়ে গেল। দয়ালজি বলেছিলেন রাতে ভয় পেলে চেঁচিয়ে ডাকবে। কিন্তু এখানকার অবস্থা যা তাতে ওর ডাকে সাড়া দেবে কে?

এই নির্জন বাড়িতে পরপর দু'দিন যেখানে অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেছে সেখানে একা রাত কাটাতে ওর ভয় যে হচ্ছে না তা নয়, তবু কতকটা জেদের বশেই রয়ে গেল ও। বন্ধুরা ওকে ফেলে চলে যাওয়ায় মনটা যে একটু খারাপ হয়নি তা নয়। তবু বিপদের কথা চিন্তা করেই কাউকে ও থাকার জন্য জোর করেনি।

রাত আটটা নাগাদ চারদিক যখন একেবারেই নিঝুম হয়ে গেল ঠিক তখনই বাইরের দরজায় টক টক শব্দ।

শুভেন্দুর বুকটা কেঁপে উঠল একটু। তবু সে সাহসে ভর করে ধীরে ধীরে এগিয়ে দরজাটা খুলে দিল। দিয়েই অবাক। দেখল দরজার সামনে দারুণ মিষ্টি দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদের একজন দেহাতি। অপরজন বাঙালি।

শুভেন্দু বলল, 'কী ব্যাপার?'

দেহাতি মেয়েটি বলল, 'দয়ালজি আমাদের পাঠালেন তোমার কাছে। এবাড়িতে তুমি একা আছ, তাই।'

শুভেন্দু বলল, 'বেশ তো। ভেতরে এসো।'

দু'জনেই ভেতরে ঢুকল।

পরের জনের হাতে একটি খাবারের জায়গা। বলল, 'রাতে তুমি এটা খাবে।'

শুভেন্দু বলল, 'রাতের খাবার তো আছে আমার।'

'তা আমি কি জানি? উনি খাবার বেঁধে দিলেন, আমরা নিয়ে এলাম।'

দু'টি মেয়েকে দেখেই অভিভূত শুভেন্দু। এমন মিষ্টি মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। বলল, 'তোমরা এসে ভালই করেছ। তবু কিছুটা সময় কথা বলে কাটবে। তা কী নাম তোমাদের?'

দেহাতি মেয়েটি বলল, 'আমার নাম রিষিয়া। দুপুরে আমি অভ্র শ্রমিকের কাজ করি। সবদিন অবশ্য না, যেদিন কাজ পাই সেদিনই করি।'

বাঙালি মেয়েটি বলল, 'আমার নাম সুবর্ণা। আমার বাবা নেই। মা-আমি দু'জনেই এখানকার ঠাকুর মন্দিরে ফুলের জোগান দিই। দয়ালজি আমাদের দু'জনকেই মেয়ের মতো ভালবাসেন। তুমি একা আছ, যদি রাতে ভয় পাও তাই পাঠালেন।'

শুভেন্দু বলল, 'সত্যিই তুমি সুবর্ণা। একেবারে কাঁচা সোনার মতো গায়ের রং। কী মিষ্টি মেয়ে তুমি। তোমরা দু'জনেই। এসো, এই খাবার আমরা তিনজনে ভাগ করে খাই।'

রিষিয়া বলল, 'না গো। আমরা খেয়ে-দেয়েই এসেছি। তুমি খাও।'

অগত্যা ওদের সামনেই বসে খেতে হল। পুরি, সবজি, ডাল আর মিষ্টি পাঠিয়েছিলেন দয়ালজি। বেশ তৃপ্তি করে তাই খেল শুভেন্দু। বলতে গেলে মেয়েরাই ওকে খাওয়াল যত্ন করে, জল দিল।

খাওয়া হলে রিষিয়া বলল, 'আমরা কোথায় শোবো, তুমি ঘর দেখিয়ে দাও।'

শুভেন্দু বলল, 'যে কোনও একাট ঘরে তোমরা শোও। আমি ওপরের ঘরে শোবো।'

সুবর্ণা বলল, 'না না। তুমিও শোবে নীচের ঘরে। আমাদের পাশের ঘরে। ওপরে শুলে রাতে যদি ভয় পাও তখন কী হবে? তোমার দেখাশোনার জন্যই তো এসেছি আমরা। তুমি যতদিন আছ ততদিনই থাকব আমরা। রান্না করে খাওয়াব। কমলাকে বারণ করে দিয়েছে দয়ালজি। আমরা তোমার কোনও অসুবিধে করব না।'

শুভেন্দু দারুণ খুশি হয়ে বলল, 'তোমরা দু'জনে থাকলে যে কী ভাল লাগবে আমার তা আমি বলে বোঝাতে পারব না।'

এরপর মেয়েরা এক ঘরে শুলে শুভেন্দুও ওদের কথামতো পাশের ঘরে শুয়ে পড়ল। একদিকে অবশ্য ভালই হল। গতকালের মতো কেউ যদি শিকল তুলে দেয় তাহলে চেঁচিয়ে রিষিয়া ও সুবর্ণাকে ডাকতে পারবে ও। পরক্ষণেই মনে হল যদি ওদের ঘরেও শিকল দেয়, তাহলে? শুভেন্দু তাই দরজা খুলে রেখেই শুয়ে পড়ল।

মধ্যরাত্রে সুগন্ধি ফুলের সৌরভে ওর ঘুম ভেঙে গেল। বেশ একটু শীতবোধও করছে ওর। কিন্তু চোখ মেলেই অবাক। এ কী করে সম্ভব। বাড়ির ছাদে ও কী করে এল? খোলা হাওয়ার জন্যই শীত করছে। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে শুভেন্দু ঝেড়ে উঠে বসতেই দেখতে পেল ওরই বয়সি এক ব্রহ্মচারী ছাদের কিনারে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

শুভেন্দু বলল, 'কে তুমি?'

ব্রহ্মচারীর সারা শরীরে যেন চাঁদের জ্যোৎস্না। বলল, 'বুঝতে পারছ না? আমি অশরীরী হয়েও জ্যোতির্ময়। দেহহীন হয়েও আমি সাধনার পথ থেকে বিচ্যুত হইনি। যজোয়ারী সম্প্রদায়ের এক মৈথিলী ব্রাহ্মণের সন্তান আমি। লোকের বাড়ি বাড়ি নানা দেবতার পূজা করে বেড়াতাম। এই বাড়ির এক কিশোরী কন্যা অনন্যা আমার খুব অনুগত ছিল। তাই ওর দাদা আমাকে হত্যা করে। এই বাগানে কুয়োর ধারে যে বেলগাছটা আছে তারই নীচে আমার দেহটা সমাধিস্থ আছে। সেই থেকে এই বেলগাছেই আমি আশ্রয় নিয়ে আছি। এরপরে মনের দুঃখে সেই কিশোরীও আত্মহননের পথ বেছে নেয়। বড় ভাল মেয়ে ছিল সে। দেব-দ্বিজে ভক্তি ছিল খুব।

শুভেন্দু বলল, 'সে এখন কোথায়?'

'সে আছে। এই বাগানেই একটি চাঁপাগাছে আশ্রয় নিয়ে আছে। ও সচরাচর নিজেকে প্রকাশ করে না। তবে ওই গাছের ফুল কেউ তুলতে গেলেই তাকে ভয় দেখায়।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী? অনন্যার দাদা একদিন বজ্রাঘাতে মারা গেল। ওর বাবা বাড়ি বিক্রি করে অন্যত্র চলে গেলেন। এবার যাঁরা এ বাড়ির মালিক হলেন তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির। তখন থেকেই আমি বিকট মূর্তি ধারণ করে ভয় দেখানো শুরু করলাম। আমার উপদ্রবে ওরা বাড়ি বেচে পালাতে পথ পেল না। এবার বাড়ি কিনলেন ভদ্রেশ্বরবাবু নামে একজন। তিনিও ভাল লোক ছিলেন না। গ্রীষ্মকালে একদিন ছাদের ওপর ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে আড্ডায় বসেছেন। সরসীবালা নামে এক দিদি এ বাড়ির কাজ করতেন। তাঁকে জল নিয়ে আসতে বলেছিলেন। সেই জল আনতে দেরি হওয়ায় তাঁকে এত জোরে লাথি মারেন যে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর। এরপর আমি এমন ভয় দেখাতে থাকি যে ভদ্রেশ্বরবাবুও একদিন আমার বিকট রূপ দেখে ভয়েই মারা যান। এই বাড়িতে একাধিক প্রেতাত্মার আনাগোনা। তবে তারা সবাই কিন্তু আমার আজ্ঞাবহ। আমরা কেউই চাই না যে এই বাড়িতে আর কারও বসবাস হোক। তোমার কাকাবাবু যখন বাড়িটা কিনলেন তখন কেন জানি না ওঁনাকে দেখে মনে হল উনি একজন সৎ ব্রাহ্মণ। তাই রাজমিস্ত্রিরা কাজে লাগলে আমরা তাদের কাজে বাধা দিইনি। তবুও তুমি তোমার বন্ধুদের নিয়ে যখন বাড়ি দেখতে এলে তখন একটু প্রমাদ গুনলাম। তাই সরসীবালাকে বললাম ভয় দেখাতে। তোমার বন্ধুরা ভয় পেলেও তুমি দেখলাম সাহসে বুক বেঁধে অবিচল রইলে। কাল রাতে আমি অগ্নিগোলক নিয়ে ভাঁটা খেলছিলাম। তুমি একটুও ভয় পেলে না। বন্ধুরা ভয় পেয়ে তোমাকে ছেড়ে চলে গেল তবু তুমি সাহসে ভর করে রয়ে গেলে। আজ সন্ধ্যায় তোমারই বয়সি দুটি মেয়ে এ বাড়িতে এল তোমার দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে। তুমি তাদের সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করলে। আজকের দিনে তোমার মতো ছেলে সত্যিই বিরল। আজ থেকে এই বাড়িতে আর কোনও অশরীরী ভয় দেখাবে না। এই অভিশপ্ত বাস্তুতে তোমরা চেষ্টা কোরো নিত্যপূজার ব্যবস্থা করতে। আর

ওই বেলগাছের পাশে একটি শিবের মন্দির গড়ে তুলো, কেমন? তাহলে আমাদের প্রত্যেকের আত্মা শান্তিলাভ করবে।'

শুভেন্দু বলল, 'এতক্ষণ যা শুনলাম তাতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। তবু শিবের একটি মন্দির আমি এখানে গড়ে তুলবই।'

জ্যোতির্ময় ব্রহ্মচারী বলল, 'এই বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণে একদল ডাকাত কয়েক বছর আগে প্রচুর ধনরত্ন পুঁতে রেখে গেছে। আমার ভয়ে তারা আর দ্বিতীয়বার এদিকে আসেনি। ওগুলোর সদ্গতি কোরো।'

শুভেন্দু বলল, 'নিশ্চয়ই করব। তবে মন্দির গড়ব বাবা-কাকার টাকায়। চোরেদের টাকায় নয়।'

ব্রহ্মচারী বলল, 'আমি খুব খুশি হলাম তোমার এই কথা শুনে। আজ রাতেই আমি বিদায় নিচ্ছি এখান থেকে। কয়েক বছরের জন্য দেশান্তরে যাব। যাবার আগে আর একটা অনুরোধ, সুবর্ণা মেয়েটি সত্যিই ভাল মেয়ে। অত্যন্ত ভক্তিমতী। বাবা নেই। জনমদুখী মা। পারলে ওকে দেখো—।'

শুভেন্দু মৃদু হেসে বলল, 'অবশ্যই দেখব। শুধু ওকে নয় ওর মাকেও দেখব।'

ব্রহ্মচারী বলল, 'শুনে খুশি হলাম।' তারপর বলল, 'তুমি, আমি প্রায় একই বয়সি। তাই আমি তো তোমাকে উপদেশ দিতে পারি না। তবু বলি, সৎভাবে জীবন কাটিয়ো। কখনও কারও ক্ষতি কোরো না,' বলে শুভেন্দুর চোখের সামনেই একটু একটু করে মিলিয়ে গেল।

শুভেন্দু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

ভোরের পাখিরা একে একে জেগে উঠলেও রাতের কালিমা তখনও ঘোচেনি। এই ঠান্ডায় আর তো ওপরে থাকা যায় না, তাই নীচে নেমে এল। দেখল দরজার সামনে রিষিয়া ও সুবর্ণা দাঁড়িয়ে।

রিষিয়া বলল, 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে ভাইদাদা? আমরা তোমার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলাম না।'

শুভেন্দু বলল, 'তোমাদের এখানকার পাখির ডাকে ঘুম ভাঙতেই আমি একটু ছাদে গিয়েছিলাম।'

'কেন গেলে? যদি তোমার কোনও বিপদ হত তাহলে দয়ালজি খুব বকত আমাদের।'

সুবর্ণা বলল, 'কী সাহস তোমার। ভয় করল না?'

শুভেন্দু বলল, 'ভয় কী? মতলবি লোকেরা, দুষ্টু লোকেরা ভয় পায়। আমরা তো তা নই। তবে কীসের ভয়?'

রিষিয়া বলল, 'তুমি কি চা খাবে?'

শুভেন্দু বলল, 'পেলে ভালই হয়। এখানে কি ব্যবস্থা আছে সেরকম?'

'জানি না। দয়ালজির দোকানের পাশে যে চায়ের দোকান সেখানেই যেতে হবে। দয়ালজি বলেছে তুমি চা খেতে চাইলে সেখানে নিয়ে যেতে। আর সুবর্ণাকেও এবার যেতে হবে ওর মায়ের কাছে। ও বাগানে বাগানে ঘুরে ফুল তুলে ওর মাকে দেবে।'

শুভেন্দু বলল, 'তবে তো যেতেই হবে ওকে।' তারপর সুবর্ণাকে বলল, 'তুমি তোমার মায়ের কাছে যাও। যখন ফিরে আসবে তখন মাকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসো। তোমরা কোথায় কীভাবে থাক তা তো আমি জানি না। আজ থেকে এই বাড়িতেই একটা ঘর নিয়ে থাকবে তোমরা। আমি তো চলে যাব কয়েকদিন পরেই। তখন বাড়ি আর ফাঁকা থাকবে না। আমিও নিশ্চিন্ত থাকব।'

সুবর্ণার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'সত্যি তুমি আমাদের থাকতে দেবে?'

'নিশ্চয়ই দেব। কাউকে না কাউকে থাকতে তো দিতেই হবে। নাহলে বাড়ি ফাঁকা থাকবে না?'

অভিভূত সুবর্ণা বলল, 'আমরা কিন্তু খুব গরিব। ভাড়া দিতে পারব না।'

শুভেন্দু হেসে বলল, 'আমি তো ভাড়া চাইছি না। তোমাদের থাকতে দিচ্ছি। তা ছাড়া প্রায়ই আমরা আসা-যাওয়া করব এখানে। আমি এলে তোমরা দু-বান্ধবীতে আমাকে চারদিক ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে।'

এইসব কথাবার্তার মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠল। একটা বালতিতে তুলে রাখা জলে মুখ-হাত ধুয়ে ওরা চলল চা খেতে। সুবর্ণা অবশ্য মাঝপথেই বিদায় নিল।

রিষিয়া শুভেন্দুকে নিয়ে চায়ের দোকানে আসতেই দেখা হয়ে গেল দয়ালজির সঙ্গে। দয়ালজি বলল, 'কাল রাতে কোনও ভয়-ডর পাওনি তো, বাবুয়া?'

শুভেন্দু বলল, 'কীসের ভয়? যেভাবে পুজো-আর্চা হয়েছে বাড়িতে তাতে যদি কোনও অপদেবতার বাস থেকেও থাকে এখন তারা শান্ত হয়ে গেছে।'

চা দোকানদার বলল, 'আর কুছু হোবে না। আপনারা ব্রাহ্মিণ আছে তো? ওই কারণে ওরা ভেগেছে।'

এরপর রিষিয়াকে ঘরে পাঠিয়ে অনেক বেলা পর্যন্ত চারদিক ঘুরে শুভেন্দু যখন ঘরে এল তখন আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। দেখল মা-কাকিমা দু'জনেই এসে হাজির।

শুভেন্দু চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, তোমরা।'

মা বললেন, 'না এসে উপায় আছে? কাল সন্ধেবেলা মধুপুর স্টেশনে কাকামণির সঙ্গে তোর বন্ধুদের দেখা হতেই জানতে পারলাম সব। সারারাত উৎকণ্ঠায় ছিলাম আমরা। ওই বাড়িতে একা তুই কী করে থাকবি?'

শুভেন্দু বলল, 'এসেছ ভালই করেছ। কয়েকটা দিন দিব্যি আনন্দে থাকা যাবে।'

রিষিয়া আগেই এসেছিল। সুবর্ণাও এসে পড়ল তখনই। ওদের দেখিয়ে শুভেন্দু বলল, 'এই দু'টি মেয়ে খুব ভাল। দয়ালজি ওদের পাঠিয়েছিলেন কাল রাতে। আর এই যে দেখেছ সুবর্ণা, এদের মা-মেয়েকে আমি এখানে একটা ঘর নিয়ে থাকতে বলেছি। এতে ওদেরও আশ্রয় হবে। আমরাও বাড়ি রক্ষার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকব।'

মা বললেন, 'এক রাতের মধ্যে এত ব্যবস্থা করে ফেলেছিস তুই? তোর বাবা জানলে খুব খুশি হবেন।'

শুভেন্দুর কাছে টাকা ছিল। তাই মা-কাকিমাকে বসিয়ে রেখে সবজি-মাছ ইত্যাদি কিনে নিয়ে এল। সেইসঙ্গে কচুরি-জিলিপি ইত্যাদি।

জলযোগ পর্ব শেষ হলে মা-কাকিমা যখন রান্নার আয়োজন করছেন তখনই মধ্যবয়সি এক রমণী এসে বললেন, 'এ কাজটা আমাকেই করতে দিন, দিদি। আমি সুবর্ণার মা। আপনার ছেলে এ বাড়িতে আমাদের মা-মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছে। প্রাণ দিয়ে এই বাড়ি আমরা রক্ষা করব।'

মা বললেন, 'তোমরা মা-মেয়ে এখানে থাকলে আমরাও নিশ্চিন্ত থাকব। তোমাদের জিনিসপত্তর কিছু নিয়ে এসেছ?'

'তেমন কিছু নেই মা আমাদের। সামান্য যা আছে তা মেয়ে যখন হোক গিয়ে নিয়ে আসবে।'

সুবর্ণার দিকে তাকিয়ে মা বললেন, 'কী সুন্দর মেয়ে তোমার। ঘর আলো করা। থাকো তোমরা মা-মেয়েতে।'

শুভেন্দু এবার মা-কাকিমাকে ইশারায় ছাদে নিয়ে গিয়ে এখানকার সব ঘটনার কথা খুলে বলল।

শুনেই মা শুভেন্দুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তোর ভয় করল না রে?'

শুভেন্দু বলল, 'ভয়কে জয় করতে পেরেছিলাম বলেই তো শুদ্ধাচারী ব্রহ্মদৈত্য ও অন্যান্য অপদেবতারা বিদায় নিল। তবে বাবা আর কাকা যেন এখানে একটা ছোটখাটো হলেও শিবমন্দির গড়ে দেন। বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণে ডাকাতরা যে ধন-সম্পদ মাটিতে পুঁতে রেখেছে তা-ও যেন উদ্ধার করে গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়।'

মা বললেন, 'সে তো দেবই। আর ওই ব্রহ্মচারীর দেহ যেখানে সমাধিস্থ আছে সেখানে একটা তুলসীমঞ্চ করে তাইতে ধূপধুনো দিয়ে তবেই আমি এখান থেকে যাব।'

মা আর কাকিমার উৎসাহে সেদিনই একটি তুলসীমঞ্চ হল।

এ যাত্রায় দশদিন থেকে ফিরে এলেন ওঁরা।

সোনার মেয়ে সুবর্ণা কয়েক মাসের মধ্যেই নানা ধরনের সুগন্ধি ফুলের গাছে ভরিয়ে তুলল এখানকার বাগানখানি। বাবা এবং কাকার প্রচেষ্টায় ছোট্ট একটি শিবমন্দিরও গড়ে উঠল সেই বাগানে। মাসে মাসে বছরে বছরে সবার যাতায়াতও চলতে লাগল নিয়মিতভাবে। শুভেন্দুর মা-বাবার ইচ্ছায় সুবর্ণাও একদিন ওদের পরিবারেই একজন হয়ে গেল।

মনিহারি ঘাটের কাহিনি

একশো বছর আগে ভাগলপুর, দুমকা, দেওঘর প্রভৃতি অঞ্চল যে কীরকম ছিল এখনকার কেউ তা কল্পনাও করতে পারবে না। পাহাড় ও জঙ্গলে ভরা সাহেবগঞ্জও ছিল তাই। সাহেবগঞ্জের গঙ্গার ধারে বীরেশ্বরবাবুরা বাস করতেন সপরিবারে। এ দেশ তখন বাংলার মধ্যেই ছিল।

এই সময় হঠাৎ একদিন কলকাতার ভবানীপুর থেকে তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু ব্রজনাথ লাহিড়ী মহাশয় এসে হাজির হলেন। সঙ্গে স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান জয়দেবকে নিয়ে। জয়দেব বাইশ বছরের সুদর্শন যুবক। তবে ম্যাট্রিক পাস করার পর ছবি আঁকা ও সংগীত চর্চায় মন দেওয়ায় কলেজে ভরতি হয়েও শেষপর্যন্ত ইতি টেনেছিল উচ্চশিক্ষায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওর কয়েকজন বন্ধু স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ও নিজে সন্দেহভাজনদের তালিকায় পড়ে যায়। সে জন্য ছেলের নিরাপত্তার কথা ভেবে ব্রজবাবু এসেছেন বন্ধুর কাছে। যদি তিনি দয়া করে ছেলেটিকে তাঁর আশ্রয়ে রাখেন কিছুদিন সেই আশায়।

বীরেশ্বরবাবু ছিলেন উদার হৃদয়ের মানুষ। বললেন, 'এ আর এমন কী কথা। ওর যতদিন ইচ্ছে থেকে যাক এখানে। আমার দুই ছেলেই রেলে চাকরি করে। একজন আছে ভাগলপুরে আর একজন এমজিএস-এ।'

ব্রজবাবু বললেন, 'এমজিএস কোথায়?'

'এমজিএস হল মোগলসরাই। বাড়িতে আমার নাতি-নাতনিরাও আছে। কোনও অসুবিধে হবে না ওর। তা ছাড়া মনিহারি ঘাটে একেবারে গঙ্গার ধারে

ছোট্ট একটা দোতলা বাড়িও আছে আমার। সে বাড়ি এখন তালাবন্ধ। মাঝে মাঝে অবসর বিনোদনের জন্য আমি যাইও সেখানে। একা থাকতে যদি ভয় না পায় তাহলে সেখানেও থাকতে পারে ও। প্রয়োজনে আমি লোক দেব। কিছুদিন থাকার পর এদেশে যদি ওর মন টিকে যায় তাহলে আমার ছেলেদের বলে রেলদপ্তরে ওর একটা চাকরির ব্যবস্থাও করে দিতে পারব।'

বীরেশ্বরবাবুর কথায় ব্রজবাবু এবং তাঁর স্ত্রী দু'জনেই আশ্বস্ত হলেন।

ব্রজবাবুর স্ত্রী সাধনাদেবী বললেন, 'আমরা জানতাম এখানে এলেই ওর উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে। ওর পক্ষে এর চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় আর হতে পারে না।'

বীরেশ্বরবাবু জয়দেবের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন, 'তোমার বাবা আর আমি হলাম অভিন্নহৃদয় বন্ধু। অবশ্যই ছেলেবেলার। আমার এই বাড়িতে তোমরা তো এর আগেও এসেছ। কাজেই এখানকার সবকিছুই তোমার চেনাজানার মধ্যে। এখন তুমিই ঠিক করো কোথায় থাকবে। আমার এই বাড়ির দোতলার কোণের ঘরটা আমি তোমার জন্য সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছি। তুমি ওখানে বসে ছবি আঁকবে, গান গাইবে। ইচ্ছামতো ঘুরবে বেড়াবে। আর যদি মনিহারি ঘাটে যাও সেখানে নির্জনতা বেশি। প্রকৃতি উদার।'

জয়দেব বলল, 'আপনি তাহলে সেখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিন।'

'বেশ, তাই হবে। একদিন গিয়ে দেখে এসো জায়গাটা, তারপর যা মন করবে তাই হবে। তবে সারাজীবন তো বেকার বসে থাকা যায় না। তাই আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব তোমার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দেওয়ার এবং সেটা সম্ভব হবে আমার দুই ছেলের দ্বারা। তোমার ম্যাট্রিক পাসের সার্টিফিকেট যা আছে তা একবার সময় করে বাড়ি গিয়ে নিয়ে এসো। নয়তো বাবাকে বল দিয়ে যেতে।'

সাধনা দেবী বললেন, 'না না, ওর যাওয়ার দরকার নেই। আমরাই বরং একদিন এসে দিয়ে যাব। আসলে কী জানেন, আমাদের এই একমাত্র সন্তান। ওকে ছেড়ে আমরা থাকিনি কখনও। ও আমাদের কাছে থাকলে ওর যে কোনও বিপদ হত তা কিন্তু নয়। তবুও পুলিশ দু'একবার এসে ওর কাছে

বন্ধুবান্ধবদের খোঁজ নিয়েছে। তাতেই ভয় পেয়েছি আমরা। পাড়ার মানদা উকিল আমাদের পরামর্শ দিলেন, পারলে ছ'মাস কি এক বছরের জন্য দূরে কোথাও সরিয়ে দিন ওকে। তা আপনার দয়ায় ছেলেটার যদি রেলেই একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যায় তবে তো সবদিক থেকেই নিরাপদ হবে।'

বীরেশ্বরবাবু ব্রজবাবুকে বললেন, 'তোমার চাকরির মেয়াদ আর কতদিন?'

'এই বছরেই শেষ। তারপর অখণ্ড অবসর।'

'আমাদের খুঁটির জোর আছে। তাই চাকরি একটা হয়ে যাবে ওর। হয়তো একটু দেরি হবে।'

'তা হোক, এখানে আপনিই ওর অভিভাবক। ওকে জীবনে দাঁড় করিয়ে দিন।'

এরপর দারুণ আনন্দে দু'তিনটে দিন কেটে গেল। জয়দেবের সুললিত কণ্ঠের গান শুনে সবাই অভিভূত। এই পরিবারের সবাই প্রায় পরিচিত ওর। বীরেশ্বরবাবুর ছোট ছেলের বউ ও দুই নাতি-নাতনি এখানেই থাকে। বড় থেকে মোগলসরাইতে। জয়দেব পরিবারের সবার আদরের পাত্র হয়ে এই দু'তিনদিনে চারদিক তোলপাড় করল।

মা-বাবা তিনদিন পরে কলকাতায় ফিরে গেলে জয়দেব এই পরিবারের সবার সঙ্গেই একদিন সকরিগলি ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে মনিহারি ঘাটে এল। জয়দেব এখানে পাকাপাকিভাবে থাকবে বলে তৈরি হয়েই এসেছিল। আবার বেশি নির্জনতা পছন্দ না হলে ফিরেই যাবে এমন পরিকল্পনাও ছিল ওর। কিন্তু এখানে এসে উন্নত পাহাড়মালার কোল ঘেঁষে বিস্তীর্ণ বালুরাশির মরুময় প্রান্তর বেয়ে গঙ্গার প্রবাহ দেখে এমনই অভিভূত হল যে এখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

বেশ কাটল দু'-একটা দিন। বীরেশ্বরবাবুরা চলে গেলে একার রাজত্ব হল জয়দেবের। ইতিমধ্যে এখানকার গ্রামবাসীদের অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছে ওর। বীরেশ্বরবাবুও রামধনি নামের একজনকে ওর দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছেন। মনিহারি ঘাট থেকে সকরিগলি ঘাটের বা সাহেবগঞ্জের নিত্য যাতায়াত আছে এখানকার লোকেদের। অতএব চিন্তাভাবনারও কোনও কারণ রইল না।

জয়দেব প্রতিদিন ভোরের পাখিরা ডেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শয্যাত্যাগ করে। তারপর গঙ্গার মরুময় বালুচরে ঘুরে বেড়ায়। গঙ্গার ওপারে ঘন অরণ্যাবৃত যে পাহাড়গুলো আছে সেদিকে তাকিয়ে গান গায়। ঘরে ফিরে এসে নিজেই পাম্প দেওয়া স্টোভ জ্বেলে ডিম পাউরুটি সেঁকে চা করে খায়। দুপুরের ভাত, ডাল, তরকারি ও রাতের ডাল, রুটি রামধনিই বানিয়ে দেয়। এদিকে দুধ ঘি আর লাড্ডু প্যাঁড়ার অভাব নেই। তাই যেদিন যেমন ইচ্ছে সেদিন তেমনই কিনে খায়। তবে দুধ ঘিয়ের জোগান দেয় এখানকারই একজন গোয়ালা।

বীরেশ্বরবাবুর এই বাড়ির পিছন দিকে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গার পর বহুদিনের পুরনো পাঁচিল ঘেরা একটা বাগান আছে। একদিন ভোরে ঘুম থেকে ওঠার পর হঠাৎ সেই বাগানের দিকে চোখ পড়ায় দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল ওর। দেখল তপ্তকাঞ্চনবর্ণা এক কিশোরী সাজি হাতে একমনে ফুল তুলে চলেছে। মেয়েটিকে দেখার পরই মন চঞ্চল হয়ে উঠল ওর। কেননা এই ক'দিনে আর কখনও ওই বাগানে ফুল তুলতে দেখেনি ওকে। কে ওই মেয়ে।

জয়দেব আজ আর গঙ্গার দিকে না গিয়ে ওই মেয়েটিকে দেখবার জন্য বাগানের দিকেই এগোল। বাগানে প্রবেশ করার কোনও অসুবিধা ছিল না। কেন না যেখানে সেখানেই পাঁচিল ভেঙে ধসে পড়েছে।

জয়দেবকে দেখেই মেয়েটি কেমন হয়ে গেল। একটু পিছু হটে এক নজর ওর দিকে তাকিয়েই দ্রুত উধাও হয়ে গেল সেখান থেকে। জয়দেব নিজের মধ্যেই নিজেকে হারাল তখন। একই অঙ্গে এত রূপ হয়?

এই বাগানে চাঁপা, গন্ধরাজ, মালতী, মাধবীর অনেক গাছ। ফুলের সুবাসে আমোদিত চারদিক। কিন্তু এত ভোরে মেয়েটি এখানে এল কী করে? তায় একা! ভয় করল না ওর?

যাই হোক, এই নির্জনে কুসুমকাননে জয়দেবের গা ছমছম করতে লাগল। ও-ও আর সেখানে বেশিক্ষণ না থেকে চলে এল গঙ্গার তীরে। মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ এদিক-সেদিক করার পর রোদ উঠলে বাসায় ফিরল।

এরপর জলযোগ পর্ব শেষ হলে মনের ক্যানভাসে মেয়েটির যে আবছা ছবি ফুটে উঠেছিল তাকেই রং তুলিতে রূপ দিতে লাগল ও।

এইভাবে অনেক বেলা পর্যন্ত কাজ করে গ্রামের অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে নিয়ে গঙ্গায় স্নান সেরে দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল মেয়েটির কথা।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলে জয়দেব আবার এদিক-সেদিকে ঘুরতে লাগল উদাসীনের মতো। ওর চোখ দুটো উৎসুক হয়ে রইল আবার যদি হঠাৎ করে মেয়েটির দেখা পায় সেই আশায়। কিন্তু না। ক্ষণদর্শনও হল না আর।

সন্ধে হতেই সব নিঝুম। ওর ঘরে এসে টর্চের আলোয় ওপরে উঠে হ্যারিকেনটা ধরাতেই মনে হল ওর পাশ কাটিয়ে কে যেন তরতর করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। জয়দেবের গা-টা একবার একটু ছমছম করে উঠলেও পরক্ষণেই এটা মনের ভুল মনে করে আবার নিজেকে সংযত করল।

স্টোভ জ্বেলে এক কাপ চা তৈরি করে খেল প্রথমে তারপর জানলা খুলে একদৃষ্টে সেই বাগানের দিকে তাকিয়ে রইল ও। মনে মনে ঠিক করল কাল ভোরে ও আবারও যাবে ওই বাগানে। প্রয়োজনে লুকিয়ে দেখবে মেয়েটিকে। তারপর স্পষ্ট করে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলবে মেয়েটির মুখ। কাদের মেয়ে? কী নাম ওর? কী ওর পরিচয়? কিছুই জানে না ও। শুধু বিদ্যুৎচমকের মতো ক্ষণিকের তরে হলেও ওর সমস্ত মনটাকে যেন উদ্ভাসিত করে গিয়েছে। ওই মেয়ের মুখ দেখার জন্য ওকে যদি দিনের পর দিন থেকে যেতে হয় এখানে তাতেও ও রাজি।

ভাবাবেগে একসময় নিজের প্রিয় গানের কলিটি গুনগুন করে গেয়ে উঠতেই শুনতে পেল মেয়ে গলায় ওরই সুরে সুর মিলিয়ে ঘরের বাইরে কে যেন গাইছে সেই গান। আশ্চর্য! কে গায়? ও টর্চ হাতে জানলার কাছে গিয়ে বাইরে আলো ফেলে দেখতে লাগল কে সেই মেয়ে! কিন্তু না। অনেক চেষ্টা করেও কাউকেই দেখতে পেল না ও।

জয়দেবের মনে হল আরও একবার গানটি গেয়ে ও পরীক্ষা করে দেখে মেয়েটি আবারও ওর সুরে সুর মেলায় কিনা। তবে তা সে করল না। এক জমাট বাঁধা বিস্ময়েই ঢেকে রাখল নিজেকে।

এরপর রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে দু'চোখ বুজে মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ল একসময়। ভোরের আলো ভালভাবে

ফুটে ওঠার আগেই সেই ঘুম ভেঙে গেল ওর। অজস্র পাখির কলতানে চারদিক তখন মুখর।

ঘুম ভাঙতেই ও চোখেমুখে জল দিয়ে সর্বাগ্রে ছুটে গেল জানলার কাছে। সেই বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখল আজও তাকে দেখা যায় কিনা। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের আর অবধি রইল না ওর। দেখল মেয়েটি একটি গাছের ডাল ধরে একদৃষ্টে ওর জানলার দিকে তাকিয়ে আছে।

জয়দেব একটুও দেরি না করে মেয়েটিকে খুব কাছ থেকে দেখবে বলে দ্রুত বাগানের দিকে এগিয়ে চলল। ওই-ওই তো সেই মেয়ে। তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কিন্তু বাগানে ঢোকার পর মেয়েটিকে আর দেখতেই পেল না ও।

এদিক-সেদিক তাকিয়ে মেয়েটিকে কোথাও দেখতে না পেয়ে জয়দেব করুণ সুরে বলল, 'কে তুমি? আমার সঙ্গে এমন লুকোচুরি খেলছ কেন? আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বাজে কোনও মতলবও নেই আমার। তুমি নির্ভয়ে ফুল তুলতে পারো। তা ছাড়া এ বাগানও আমাদের নয়।'

হঠাৎ খিলখিল হাসির শব্দে ভরে উঠল চারদিক। কিন্তু মেয়েটিকে আর দেখা গেল না। হতোদ্যম হয়ে জয়দেব যখন ফিরে আসছে তখন সুগন্ধি কয়েকটা চাঁপা ফুল কেউ যেন পিছন দিক থেক ছুড়ে দিল ওর গায়ে। জয়দেবের সারা শরীর কেমন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ও ধীর পায়ে বেরিয়ে এল বাগান থেকে। পাঁচিলের বাইরে এসে একবার বেশ ভালভাবে তাকিয়ে দেখল বাগানের দিকে। তারপর ভোরের আবছায়ায় ধীরে ধীরে গঙ্গার দিকে এগিয়ে চলল।

অনেকক্ষণ গঙ্গার ধারে এদিক-সেদিক ঘুরে যখন ঘরে ফিরল রামধনি তখন দরজার কাছে চুপ করে বসে আছে। জয়দেব বলল, 'কী ব্যাপার! তুমি আজ এত সকালে?'

রামধনি বলল, 'আমাকে আজ একবার সাহেবগঞ্জে যেতে হোবে বাবুজি। তাই আপনার খানা চটপট বানিয়ে দিয়ে চলে যাব।'

জয়দেব বলল, 'এই কথা? কোনও দরকার নেই, তুমি যাও। আজ আমি হোটেলেই খেয়ে নেব।'

রামধনি চলে গেলে জয়দেব ওর ঘরে এসে চা বানিয়ে খেয়ে নিল। তারপর সেই অসমাপ্ত ছবির কাছে এসে মেয়েটির মুখ বারবার কল্পনা করতে লাগল। একেবারে সামনে থেকে ভালভাবে মুখ না দেখলে ছবিটা অবিকল হবে না। ও তো এখানে চিরদিনের নয়। তবে এই ছবির মুখ ওর ক্যানভাসে বরাবরের জন্য রয়ে যাবে।

এইভাবেই সারাটা দিনদুপুর কাটল। বিকেলে আজ আর গঙ্গার ধারে না গিয়ে গ্রামের আনাচকানাচে ঘুরতে লাগল জয়দেব। উদ্দেশ্য একটাই। ওই মেয়েটিকে একেবারে খুব কাছে থেকে দেখা। ও যে এখানকারই মেয়ে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। না হলে অত ভোরে ওই নিভৃত কাননে ফুল তুলতে আসত না। কিন্তু না। ঘুরে বেড়ানোই সার হল ওর। সেই মেয়ের আর দেখা মিলল না।

যাই হোক, সন্ধের পর ঘরে এসে দেখল রামধনি ওর জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে। ও যেতেই একটা ঝোলা ওর হাতে দিয়ে বলল, 'সাহিবগঞ্জের বাবুজি তুমহারে লিয়ে ভেজা। রাত কা খানা। খাও তুম।'

জয়দেব দারুণ খুশি হয়ে ওদের পরিবারের কুশল জেনে ওপরে উঠল। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আবার সেই একই ব্যাপার। মনে হল কে যেন ওর পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল তরতর করে। শুধু যে নেমে গেল তা নয়, একরাশ সুগন্ধি ফুলের সৌরভও ছড়িয়ে দিয়ে গেল সেখানে।

এবার কেমন যেন একটু ভয় পেয়ে গেল জয়দেব। একটু সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে এসে প্রথমেই একটা বাতি ধরাল। তারপর হ্যারিকেন জ্বেলে বাতি নিবিয়ে টান হয়ে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। অনেকটা পথ হেঁটেছে আজ। এবার একটু বিশ্রামের দরকার।

শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই ওর মনে হল গতকাল ও গান গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে গলায় কে যেন ওর সুরে সুর মিলিয়েছিল। যদিও অনেক চেষ্টা করেও তার কোনও অস্তিত্ব টের পায়নি ও। তাই আজ একবার পরীক্ষা করে দেখবে কালকের মতো হয় কিনা। যেই মনে হওয়া অমনি উদাত্ত গলায় ওর প্রিয় একটি গান গেয়ে উঠল ও। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে এক কোকিলকণ্ঠী কণ্ঠ মেলাল ওর গানের সঙ্গে।

জয়দেব মুহূর্তমাত্র দেরি না করে টর্চ হাতে নেমে এল নীচে। তারপর আলো ফেলে দেখতে লাগল এদিক-সেদিক। কিন্তু কোথায় কে? গান আছে, গায়িকা নেই। মনে হচ্ছে কেউ যেন ওর গাওয়া সেই গান গাইতে গাইতে গঙ্গার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জয়দেব হঠাৎই লক্ষ করল সেই সে। সেই মেয়ে। তবে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে তাকে। যদিও মুখ দেখা যাচ্ছে না তবুও মনে হল ওই মেয়ে সে ছাড়া আর কেউ নয়।

জয়দেব মরিয়া হয়ে উঠল ওর নাগাল পাওয়ার জন্য। কে ওই ছলনাময়ী তা ওকে জানতেই হবে। এখানে মরুময় প্রান্তর। তার শেষে গঙ্গার প্রবাহ। অতএব পালাবার পথ নেই। ওর মুখোমুখি না হলে রাতে ও ঘুমোতেই পারবে না। এত যার রূপ, এমন যার গানের গলা, কেন সে আড়ালে থাকে এই প্রশ্নটাই করবে সে ওকে।

বেশ কিছুদূরে যাবার পর এক জ্যোতির্ময় পুরুষ ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন ওর দিকে। একটা হাত নেড়ে দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, 'আগে মত বাড়ো।'

সেই জ্যোতির্ময়ের সামনে মাথা নত করে দাঁড়াল জয়দেব। ততক্ষণে মেয়েটিও অদৃশ্য হয়েছে। গানও থেমে গিয়েছে। তাই বাধ্য হয়েই আর পিছু না তাকিয়ে বাসায় ফিরে এল।

এরপর অনেকটা সময় বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে বীরেশ্বরবাবুর পরিবারের তরফ থেকে পাঠানো ডালপুরি, কষা আলুর দম, দহিবড়া ও নানারকম মিষ্টি খেয়ে হ্যারিকেনের বদলে চিমনি জ্বেলে শয্যাগ্রহণ করল।

মধ্যরাতে হঠাৎ খুটখাট শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল ওর। মনে হল কেউ যেন ওর ঘরের জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। সঙ্গে সঙ্গে গায়ের চাপা সরিয়ে টর্চ হাতে উঠে বসতেই দেখতে পেল দরজার খিল খুলে অস্পষ্ট এক ছায়ামূর্তি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঠিক সেই মেয়েটির মতো।

ও কোনওরকমে দরজার কাছে গিয়ে খিলটা আবার লাগিয়ে দিল। তবে নীচে নেমে যাওয়ার মতো সাহস আর হল না ওর। কী যে হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কিছুই বোধগম্য হল না। মেয়েটি নিশ্চয়ই কোনও ফাঁকে ঘরে ঢুকে লুকিয়েছিল কোথাও। কিন্তু তাই-বা কী করে সম্ভব?

হঠাৎই ক্যানভাসের ছবির দিকে নজর পড়ায় শিউরে উঠল ও। দেখল

ক্যানভাসের ছবির ভেতর থেকে সেই মেয়েটির চোখ ওর দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে আছে। তার চেয়েও আশ্চর্য! কোনও দক্ষ শিল্পীর হাতে ছবিটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে রং তুলির প্রলেপে।

জয়দেব মুগ্ধ চোখে সেই ছবির দিকে একভাবে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আবার এসে শয্যাগ্রহণ করল। তবে সে রাতে আর ঘুমই এল না ওর দু'চোখে।

পরদিন পাখিডাকা ভোরে জয়দেব জানলার কাছে এসে বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখল সেই মেয়ে। ফুলের সাজি হাতে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর জানলার দিকে। ও একটু পিছু হটে কোনওরকমে চোখে-মুখে জল দিয়েই উন্মাদের মতো ছুটে চলল বাগানের দিকে। যেভাবেই হোক, আজ ওর মুখোমুখি হতেই হবে ওকে।

বাগানের ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকেই স্থির হয়ে গেল জয়দেব। এ কোন রূপবতী রূপের পসরা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর চোখের সামনে? সর্বাঙ্গে তার ফুলের সাজ। মুখে মৃদু হাসি। ওর প্রতি কত অনুরাগ, কত ভালবাসা যেন সঞ্চিত আছে ওর বুকের ভেতর। হাতের সাজিতে কত ফুল। চাঁপা, গন্ধরাজ, আরও কত ফুল। ফুলের গন্ধে বিভোর হয়ে জয়দেব এক-পা এক-পা করে এগিয়ে গেল তার দিকে। আজ কিন্তু সে পিছু হটল না, পালিয়ে গেল না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই রইল। জয়দেব ওর আরও কাছে গিয়ে চোখে চোখ রাখতেই কী যেন হয়ে গেল ওর। মাথাটা ঝিমঝিম করে লুটিয়ে পড়ল বাগানে ঘন সবুজ ঘাসের ওপর।

কতক্ষণ ওইভাবে পড়েছিল জয়দেব তা ওর চেতনায় নেই। হঠাৎই কানে এল, 'ওঁ নমঃ শিবায় ওঁ নমঃ শিবায়।' মন্ত্রের ধ্বনিতে সংবিৎ ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসল ও। দেখল ওর সামনেই বড় একটি বেলগাছের ছায়ার নীচে প্রশান্তবদনে দাঁড়িয়ে আছেন গত সন্ধ্যার সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ।

জয়দেব কোনওরকমে উঠে দাঁড়াতেই উনি করুণার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মায়া-মায়া। ও নেহি মিলেগি। মোহিনী মায়া। তুম চলি যাও বাবা।'

জয়দেব ওঁকে কোনও প্রশ্ন করা দূরের কথা এমনভাবে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে

গেল যে কিছু বলতেই পারল না। তাই মাথা নত করে চলে আসতে গিয়েও আর একবার পিছু ফিরে তাকিয়েই দেখল সেই জ্যোতির্ময়ও চোখের পলকে বিলীন হয়ে গিয়েছেন।

ক্লান্ত বিষণ্ণ জয়দেব কোনও রকমে ঘরে এসে ওর বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল।

অনেক পরে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠে বসতেই দরজার কাছ থেকে সুরেলা গলায় কে যেন বলল, 'চায় পিয়োগে বাবুজি?'

জয়দেব ঘুরে তাকিয়েই স্থির। একি স্বপ্ন না বাস্তব! সেই সে, যে ওর মন প্রাণ সমস্ত আত্মাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ কী করে সম্ভব! জয়দেবের বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ওঠার আগেই ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সে। তারপর ক্যানভাসের সেই ছবির দিকে চোখ পড়তেই হাত দুটো কেঁপে ট্রে শুদ্ধ চায়ের কাপ পড়ে গেল মেঝেতে।

শব্দ শুনে দ্রুত ওপরে এল রামধনি। অবস্থা দেখে বলল, 'সোহিনী, ইয়ে ক্যা কর দিয়া তু নে?'

জয়দেব নিজেই তখন ভাঙা কাপ ও কাচের টুকরো ট্রেতে রেখে একটা গামছা দিয়ে মেঝেয় পড়া চা মুছে নিল।

সোহিনী তখন লজ্জায় জিভ কেটে জয়দেবের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবুজি, মেরা ইয়ে তসবির আপকো ক্যায়সে মিলা? কিনোনে বনায়া ইয়ে তসবির? পহলে তো কভি আপ দিখা নেহি মুঝে?'

রামধনিও অবাক হয়ে বলল, 'এ ক্যায়সে হো সকতা? সোহিনী বহিন কাল রাতে নাথনগর থেকে এখানে এসেছে। লেকিন তুমি ওকে একবারও না দেখে ওর ছবি কী করে এঁকে দিলে বাবুজি?'

জয়দেব বলল, 'তা তো জানি না। একটা মুখ মনে হল, কল্পনা করে এঁকে দিলাম।'

রামধনি বলল, 'তুমি দেবতা আছ বাবুজি। ঠিক আছে, থোড়া ইন্তেজার করো, আমি তোমার জন্য চা নিয়ে আসছে।'

জয়দেব বলল, 'চা তো নিজেই করি। আজ হঠাৎ তুমি...?'

রামধনি বলল, 'বাবুজি, গোপালদাসজির বাড়িতে আজ রাধাগোবিন্দের

পুজো। আজ দুপুরে সন্ধ্যায় সবাই আমরা প্রসাদ পাব ওদের বাড়িতে। সে জন্যই সোহিনী চায় বনাকে নিয়ে এসেছিল তোমার জন্য। লেকিন তোমার ঘরে ওর ছবি দেখেই হাত কেঁপে গেল ওর।'

রামধনি চলে গেলেও সেই ছবির দিক থেকে চোখ ফেরাল না সোহিনী। মাঝে মাঝে বলতে লাগল, 'কী সুন্দর।'

জয়দেব ওর বিছানায় বসে সোহিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি নেবে?'

'যদি তুমি দাও, হম তুমকো জিন্দগিভর ইয়াদ রাখুঙ্গি।'

'বেশ, আমি তোমাকে দিলাম।'

'সচ?'

'হ্যাঁ তোমার ছবি তোমার কাছে থাকাটাই ভাল।' একটু পরেই আবার চা ও কেক নিয়ে রামধনি এল। বলল, 'এটা খেয়ে নাও বাবুজি। সোহিনীর পিতাজি এখনই আসবেন তোমার কাছে। ওদের বাড়িতে প্রসাদ পাওয়ার জন্য বলতে আসবেন।'

আসল ব্যাপারটা জয়দেবের কাছে তখন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ও চটপট চা পর্ব শেষ করল। তারপরই সস্ত্রীক গোপালদাসজি এসে হাজির হলেন।

ওঁরা এসে মেয়ের ছবির দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আঁকার খুব প্রশংসা করতে লাগলেন। বারবার ছবির দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, 'এটা কী করে সম্ভব হল? আপনি তো আমার মেয়েকে এর আগে কখনও দেখেননি?'

জয়দেব হেসে বলল, 'আমাকে আপনি নয় তুমি বলবেন। আমি আপনাদের সন্তানের মতো। ওই মেয়েকে আমি রোজই দেখি।'

গোপালদাসজি ও তাঁর স্ত্রী চমকে উঠলেন জয়দেবের কথা শুনে। বললেন, 'রোজই দেখেন? কিন্তু ও তো এখানে থাকে না।'

জয়দেব তখন রামধনির দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, 'সোহিনীকে নিয়ে তুমি একটু নীচে যাও তো রামধনি।'

রামধনি আর সোহিনী দু'জনেই নীচে গেল।

জয়দেব তখন আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল গোপালদাসজিকে।

সব শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন ওরা দুই স্বামী-স্ত্রী। বললেন, 'তুমি যাকে দেখেছ সে আমারই মেয়ে মোহিনী। মোহিনী আর সোহিনী দু'জনেই জড়ুয়া

বহিন। মানে যমজ বোন। মোহিনী ওই বাগানে ফুল তুলতে গিয়ে সাপকাটি হয়ে মারা যায়। তোমাকে ওর ভাল লাগে বলেই ও বারেবারে ওইভাবে দেখা দেয়। একবছর হল মেয়েটা নেই। সোহিনীও ওর শোক ভুলতে না পেরে আমার ভাই, মানে আঙ্কেলজির কাছে নাথনগরে গিয়ে থাকে। শুধুমাত্র পূজার কারণে কাল রাতে এখানে এসেছে ও। দু'চারদিন থেকে আবার চলে যাবে। তা একটা কথা বলি বাবা, তোমার মনের মধ্যে মোহিনীর জন্য যদি কোনও অনুরাগ থাকে তা হলে সেই জায়গাটা সোহিনী কি পূরণ করতে পারে না? একই রকম দেখতে তো ওদের দু'বোনকে।'

জয়দেব বলল, 'অবশ্যই পারে। আমি আমার দিকটা বুঝে নেব। আপনারা শুধু ওর মনটা যাচাই করে নিন।'

গোপালদাসজি সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন জয়দেবকে। তারপর দারুণ উল্লসিত হয়ে ডাক দিলেন মেয়ের নাম ধরে।

রামধনির সঙ্গে সোহিনী এলে সস্ত্রীক গোপালদাসজি তাকেও জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন কিছুক্ষণ।

ওদের কান্না দেখে জয়দেবেরও চোখে জল এসে গেল। গোপালদাসজি তখন ছবির বৃত্তান্ত সবই বুঝিয়ে বললেন মেয়েকে। তারপর তাঁর মনোবাসনার কথাও জানালেন। বললেন, 'এই বাবুজির অমত নেই। অব তেরা মন কি বাত বতাও।'

সোহিনী কোনও কথা না বলে একবার ক্যানভাসের সেই ছবির দিকে তাকাল। তারপর নতবদনে ধীর পায়ে জয়দেবের কাছে এসে পাশে দাঁড়িয়ে একটা হাত দু'হাতের মুঠোয় পুরে সম্মতি জানাল ওর।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। সে দিনটা পুজোবাড়ির উৎসবের আনন্দে কেটে গেল। পরদিন সকালে রামধনিকে সঙ্গে নিয়ে গোপালদাসজি সাহেবগঞ্জে গেলেন বীরেশ্বরবাবুর কাছে এই ব্যাপারে কথা বলতে। সোহিনীও আর আঙ্কেলজির কাছে ফিরে না গিয়ে এখানেই মা-বাবার কাছে থেকে যাবার মন করল।

তবে সেদিন থেকে মোহিনীর ছায়াশরীর আর একবারের জন্যও দেখা গেল না।

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ২৫ ফাল্গুন ১৩৪৭। ইংরেজি ১৯৪১। মধ্য হাওড়ার খুরুট ষষ্ঠীতলায়।

কিশোর বয়স থেকেই সাহিত্য সাধনার শুরু। ১৯৬১ সাল থেকে আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় আলোচনীর সঙ্গে লেখালেখিসূত্রে যুক্ত থাকলেও, ১৯৮১ সালে প্রকাশিত ছোটদের জন্য লেখা 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'ই লেখককে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

লেখক মূলত অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, তাই দেশে-দেশে ঘুরে যে-সব দুর্লভ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁর প্রতিটি রচনার কাহিনিনির্মাণে ও চরিত্রচিত্রণে।

.....

প্রচ্ছদ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

রোমাঞ্চকর কাহিনি রচনায়

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের জুড়ি নেই।

চমকপ্রদ পরিবেশনায় মিশে আছে

গা-ছমছমে আবহ। বইয়ের পাতা থেকে

পাঠক চোখ তুলতেই পারবেন না।

9 789388 870931